হোম নার্সিং

জুলফিয়া ইসলাম

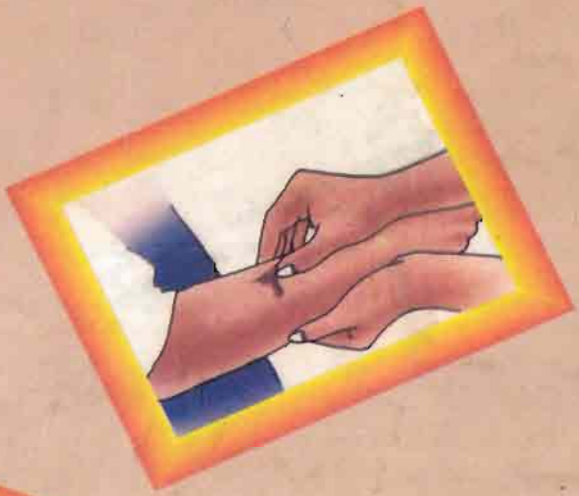

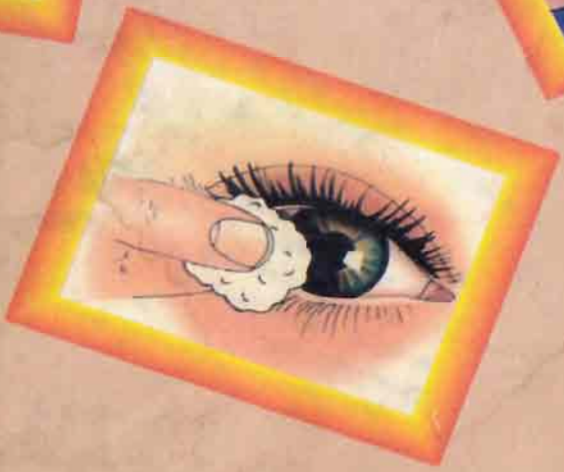

হোম নার্সিং

(প্রাথমিক চিকিৎসা)

জুলফিয়া ইসলাম

ভূমিকা

দুর্ঘটনাবহুল আমাদের এই জীবন। কখন, কোথায় কার জীবনে হঠাৎ কোন্ দুর্ঘটনা ঘটে যায় তার কোনও রকম নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু দুর্ঘটনার সময়টাতে দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তিটিকে তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করা অত্যন্ত জরুরী। এ ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সমাজের সকল স্তরের নাগরিকেরই। কিন্তু আমাদের অনেকেরই এ সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের অভাব আছে। এ জন্য দেখা যায় যে, দুর্ঘটনার সময়টিতে আমরা সকলেই সঠিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। উপযুক্ত সময়টুকুতে সঠিক ব্যবস্থা না নিয়ে আমরা দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু প্রতিটি নাগরিকেরই উচিত বিজ্ঞানসম্মত উপযুক্ত প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান থাকা। প্রতিটি সুস্থ নাগরিকেরই যদি উপযুক্ত প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান থেকে থাকে তবে জীবন রক্ষা করা সহজ হয় এবং নানা রকম জটিল পরিস্থিতির মোকাবেলা করা যায়।

স্বাস্থ্য মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। স্বাস্থ্যের যত্নে যে সবার অধিকার আছে তা নয়। স্বাস্থ্যের প্রতি সবার দায়িত্ব ও কর্তব্যও আছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে কমবেশি জ্ঞান সবারই থাকা উচিত। এতে করে অনেকে বাড়িতে বসে কম সময়ে কম খরচে সমস্যা এড়াতে এবং সারিয়ে তুলতে পারবেন। রোগ হলে ডাক্তারের সাহায্য নিতে হবে। কিন্তু সব সময় চিকিৎসক হাতের কাছে পাওয়া যাবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। সাধারণ মানুষ যদি তার স্বাস্থ্যের জন্য কি কি দরকার এবং কোন্‌টা আগে দরকার সেটা নিজে থেকেই বুঝতে পারে। তবে অনেক ক্ষেত্রে নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই করতে পারবে। তবে নিজ ক্ষমতার বাইরে কিছু করাটা ঠিক নয়।

আমাদের দেশে নারী ও শিশু মৃত্যুহার অত্যন্ত বেশি। উপযুক্ত সময়ে সঠিক জ্ঞানের অভাবে আমাদের দেশের বহু লোক অকালে প্রাণ হারায়। মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা জাগিয়ে তোলা এবং সুস্বাস্থ্য গড়ে তোলা আমাদের সবারই লক্ষ্য ও কাম্য হওয়া উচিত।

আমি স্বাস্থ্য বিষয়ক সাময়িকী ও বিভিন্ন বই পড়ে এই বইটি লেখার চেষ্টা করেছি, যাতে করে প্রয়োজনে বইটি মানব সেবার কাজে লাগে।

বইটিতে কিঞ্চিত ভুলভ্রান্তি থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আশা করি বিদগ্ধ পাঠক তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। সেই সাথে বইটি যদি আমাদের এই দরিদ্র দেশের আপামর জন সাধারণের কল্যাণে আসে তবে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করবো।

—জুলফিয়া ইসলাম

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা এবং চিকিৎসক

দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা, প্রাথমিক চিকিৎসক, প্রাথমিক চিকিৎসকের গুণাবলী, প্রাথমিক চিকিৎসকের কর্তব্য, কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসকের কাজের সীমাবদ্ধতা, প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য, দুর্ঘটনার কারণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
রোগীর শুশ্রূষা প্রণালী বা নার্সিং

শুশ্রূষাকারী বা নার্স, রোগীর শয়নকক্ষ, রোগীর শয্যার স্থান, রোগীর জন্য কোন্ কোন্ ধরনের জিনিসপত্র আবশ্যক (কি কি জিনিস রাখবেন), নার্সিং-এর ক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা, নিষ্ঠাবান হওয়া, ধৈর্য্য ও সহানুভূতিশীল হওয়া, নার্সিং, নার্সিং-এর ক্ষেত্রে যে সব নিয়ম মানা উচিত, নার্সিং-এর ক্ষেত্রে যে শিক্ষাগুলো বিশেষ প্রয়োজনীয় (কিভাবে মাথা ধোয়াবেন, রোগীর নাড়ী দেখার পদ্ধতি, কিভাবে শরীরের তাপ নেবেন, শ্বাস প্রশ্বাস পরীক্ষা করার নিয়ম, আইস ব্যাগ কিভাবে প্রয়োগ করবেন, হট ওয়াটার ব্যাগ দেবার পদ্ধতি, প্রেসার পরীক্ষা করা, রোগীকে স্পঞ্জ করানো)।

তৃতীয় অধ্যায়
পুড়ে যাওয়ার চিকিৎসা

ত্বক সম্পর্কে কিছু কথা, পোড়ার কারণ, গভীর ও অগভীর পোড়ার লক্ষণ কিভাবে বুঝবেন, আগুনে পোড়া রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা, রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা পুড়ে যাওয়া রোগীর কি ব্যবস্থা করবেন, আগুনে পোড়া কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়
পানিতে ডোবার চিকিৎসা

পানিতে ডুবে মৃত্যুর কারণগুলো, পানিতে ডোবা রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা কিভাবে করবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্বাসরোধ

শ্বাসরোধের কারণগুলো, শ্বাসরোধের প্রথম অবস্থার লক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা কিভাবে করবেন, শ্বাসরোধের কারণগুলো কিভাবে দূর করবেন, শ্বাসরোধ হলে প্রাথমিক চিকিৎসা কিভাবে করবেন, শ্বাসনালীতে কিছু আটকে যদি দম বন্ধ হয়ে যায় তবে কি করবেন, কিভাবে বুকে বা পেটে চাপ প্রয়োগ করা হয়, বিষাক্ত ধোঁয়ায় যদি শ্বাসরোধ হয়ে যায়, রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে শ্বাসরোধ হলে কি করবেন, কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস ক্রিয়া চালানোর পদ্ধতি, কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে কৃত্রিমভাবে শ্বাসক্রিয়া চালানো হয় (মুখের মধ্যে মুখ দিয়ে শ্বাস ক্রিয়া চালানো, বুকের পেছন দিক দিয়ে কৃত্রিম পদ্ধতিতে শ্বাস ক্রিয়া চালানো, রোগীর পেট ও বুকের সংযোগ স্থলে চাপ দিয়ে কিভাবে শ্বাস ক্রিয়া চালু করবেন, সিল্‌ভেস্টার প্রণালীতে শ্বাস ক্রিয়া চালানো, দাঁড়ানো অবস্থায় রোগীর বুকে চাপ দিয়ে শ্বাস ক্রিয়া চালানো, বুকের মধ্যে চাপ দিয়ে শ্বাস ক্রিয়া চালানো, হোলজার নেলসন পদ্ধতি)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কুকুরের কামড়

প্রাথমিক চিকিৎসকের কিছু কর্তব্য, জলাতঙ্কগ্রস্থ কুকুর চেনার উপায়, প্রাথমিক চিকিৎসা।

সপ্তম অধ্যায়

অচৈতন্য হওয়া (শক্)

কি কি কারণে রোগীর অচৈতন্য অবস্থার সৃষ্টি হয়, রোগীর অচৈতন্য অবস্থার লক্ষণ ও চিহ্ন, হিস্টিরিয়া জনিত শক্, প্রাথমিক চিকিৎসার পদ্ধতি, অতিরিক্ত মদ্যপান কিংবা নেশা জাতীয় কোনও জিনিসের কারণে অচৈতন্য হলে, প্রাথমিক চিকিৎসার পদ্ধতি, মৃগী রোগী অচৈতন্য হলে, মৃগী রোগের লক্ষণ ও চিহ্ন, মৃগীর ফিট হলে কি করণীয়, সন্নাস রোগ, প্রাথমিক চিকিৎসার পদ্ধতি, কোনও দুর্ঘটনার কারণে স্নায়বিক শক্, স্নায়বিক শক্ প্রাপ্ত হলে তার লক্ষণ, এই ধরনের অবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসার পদ্ধতি, শক্ অবস্থায় কি কি করা অনুচিত।

অষ্টম অধ্যায়

রক্ত পাত এবং ক্ষত

প্রাথমিক চিকিৎসা কিভাবে করবেন, রক্তপাত বেশি হলে বুঝবেন কিভাবে, ক্ষত থেকে রক্তপাত বন্ধ করার উপায়, সাবধানতা অবলম্বন করা, রক্তপাত বেশি হলে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পাবে, বিভিন্ন অঙ্গের রক্তপাত (নাক দিয়ে রক্তপাত, কান

দিয়ে রক্তপাত, দাঁত দিয়ে রক্তপাত), ছোটখাটো ক্ষত হতে অল্প রক্তক্ষরণের প্রাথমিক চিকিৎসা (কিভাবে ড্রেসিং করবেন, কেন ড্রেসিং করবেন, বিভিন্ন ধরনের ড্রেসিং)।

নবম অধ্যায়

হাড় ভেঙ্গে গেলে

হাড় ভাঙ্গার কারণ সমূহ, হাড় ভাঙ্গার প্রাথমিক চিকিৎসা, হাড় ভাঙ্গার লক্ষণ সমূহ বুঝবেন কিভাবে, হাড় ভেঙ্গে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পদ্ধতি, বিভিন্ন ধরনের হাড় ভাঙ্গার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থা, হাড় মচকে গেলে প্রাথমিক অবস্থায় করণীয় কাজ।

দশম অধ্যায়

বিভিন্ন তাপদাহের আঘাত

তাপদাহের লক্ষণ বোঝার উপায়, প্রাথমিক চিকিৎসা, গরমে খিল ধরা, চিকিৎসা পদ্ধতি, তাপদাহ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা।

একাদশ অধ্যায়

চোখের আঘাত সম্পর্কে কিছু কথা

চোখে যদি কিছু পড়ে তবে লক্ষণ বুঝবেন কি করে, কিভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করবেন, সব সময়ে চোখকে নিরাপদে রাখবেন কিভাবে, চোখের কতগুলো সাধারণ সমস্যা ও তার ঘরোয়া প্রতিকার (চোখ ওঠা, করণীয়, চোখ ওঠা না ছড়ানোর উপায়, চোখে অঞ্জনি ওঠা, দৃষ্টি শক্তির অক্ষমতা, ভিটামিন 'এ'-র অভাবজনিত রোগ, ভিটামিন 'এ'-র অভাবজনিত রোগের লক্ষণ, ভিটামিন 'এ' পেতে হলে কি করবেন, ট্র্যাকোমা, ট্র্যাকোমার লক্ষণ বুঝবেন কি করে, কিভাবে ট্র্যাকোমা এড়াবেন, চোখ দিয়ে পানি পড়া, চিকিৎসা পদ্ধতি, চোখের সাদা অংশ লাল হয়ে যাওয়া, কর্নিয়ার আলসার, টেরিজিয়াম)।

দ্বাদশ অধ্যায়

দাঁত, মাড়ি ও মুখের কিছু সমস্যা

কিভাবে দাঁত ব্রাশ করবেন, কতক্ষণ সময় ব্রাশ করবেন, দিনে কতবার ব্রাশ করবেন, কি দিয়ে ব্রাশ করবেন, দাঁতের কিছু সাধারণ রোগ ও তার নিরাময়ের ব্যবস্থা (পায়েরিয়া, পায়েরিয়া এড়ানোর উপায়), জীবনভর দাঁত সুরক্ষার জন্য কতিপয় উপদেশ, মুখের একটি বিব্রতকর সমস্যা, চিকিৎসা, ঠোঁটের কোণে ঘা, মুখের থ্রাশ, জিহ্বার ওপরে সাদা পর্দা পড়া।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চামড়ার বিভিন্ন সমস্যা ও তার কিছু সমাধান

চুলকানি যখন সমস্যা, চিকিৎসা, ফোড়া, ফোড়ার জন্য চিকিৎসা, দাদ, কিভাবে দাদের চিকিৎসা করবেন, দাদের সংক্রমণ কিভাবে এড়াবেন, এলার্জির চিকিৎসা ও প্রতিকারের উপায়, ত্বকের ফাংগাস ইনফেক্শনে করণীয়, ফাংগাস ইনফেক্শন এড়াতে হলে, সউদ, নানা ধরনের ব্রণ, ব্রণ হলে বুঝবেন কিভাবে, ব্রণের চিকিৎসা, একজিমা সারানোর উপায়, একজিমার লক্ষণ, ঘরোয়া চিকিৎসা, মাথার ছত্রাক (ফাংগাস) রোগ, কিভাবে মাথার ছত্রাকের লক্ষণ বুঝতে পারবেন, চিকিৎসা, চুলের খুশকি ও উকুন, খুশকির চিকিৎসা, খুশকি প্রতিকারের কিছু ঘরোয়া চিকিৎসা, উকুন, ঘরোয়া চিকিৎসা।

চতুর্দশ অধ্যায়

বিষক্রিয়া

সাধারণত যে বিষগুলোর কারণে অধিক মৃত্যু ঘটে থাকে, প্রাথমিক চিকিৎসার পদ্ধতি, বিষক্রিয়াতে করণীয়, কোন্ কোন্ অবস্থায় বমি করানো যাবে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সাপের কামড়

বিষাক্ত সাপ বোঝার উপায়, বিষধর সাপের বিষক্রিয়া শরীরে নিম্নোক্ত প্রতিক্রিয়া ঘটায়, সাপের কামড়ের স্থানে গতানুগতিক লক্ষণগুলো, বিষাক্ত সাপের কামড়ের চিকিৎসা, বিষাক্ত কীট পতঙ্গের দংশন, প্রাথমিক চিকিৎসা।

ষোড়শ অধ্যায়

গলায় কোনও খাদ্য দ্রব্য কিংবা অন্য কোনও জিনিস আটকালে

প্রাথমিক চিকিৎসা, নাকে কিংবা কানে কিছু ঢুকলে, করণীয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

কয়েকটি খুব সাধারণ রোগ ও তার ঘরোয়া প্রতিকার

সর্দিজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে কিছু ঘরোয়া চিকিৎসা, সর্দি হলে কি করবেন, সাইনোসাইটিস, লক্ষণ বোঝার উপায়, প্রাথমিক চিকিৎসা, গলায় ব্যথা আর টনসিলের প্রদাহ, এই রোগের লক্ষণ, টনসিলের ঘরোয়া চিকিৎসা, রিউম্যাটিক ফিভার (বাতজ্বর), লক্ষণ, চিকিৎসা, হাঁপানি, হাঁপানির চিকিৎসা, ঘরোয়া প্রতিকার, কাশি, কিভাবে কাশির প্রাথমিক চিকিৎসা করবেন, নিউমোনিয়া,

নিউমোনিয়ার লক্ষণ বোঝার উপায়, প্রাথমিক চিকিৎসা, ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কাইটিসের লক্ষণ বোঝার উপায়, প্রাথমিক চিকিৎসা, খুব বেশি জ্বর হলে, বেশি জ্বর হলে করণীয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

পেটের বিভিন্ন রোগ চিকিৎসা ও করণীয়

বদহজম, লিভারের অসুখ, লিভারের সাথে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের সম্পর্ক, পিগমেন্টেশন, চুলকানি, এলার্জি, শিরার স্ফীতি, নখ, হরমোন, যাদের লিভারের সমস্যা আছে, শিশুদের ব্যাপারে সতর্কতা, আলসার, আলসারের কারণ, আলসারের লক্ষণ, আলসারের প্রকারভেদ, গ্যাস্ট্রিক আলসার, আলসার হলে করণীয়, কি করা উচিত নয়, অন্যান্য কিছু নিয়ম, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, ডায়রিয়া কি, ডায়রিয়ার প্রকারভেদ, ডায়রিয়ার প্রতিকার, রিহাইড্রেশন থেরাপী, চালের তৈরি খাবার স্যালাইন, রোগী যদি শক্‌প্রাপ্ত হয়, শিশুকে কখন হাসপাতালে বা চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করবেন, বিলম্ব হলে, ডায়রিয়া প্রতিরোধ, বাড়িতে নিরাপদ খাবার তৈরি করবেন কিভাবে, বমি যখন বিব্রতকর সমস্যা, নির্দিষ্ট রোগ নির্ণয়ে বমির প্রকারভেদ, বমি হলে করণীয়।

উনবিংশ অধ্যায়

কিছু মহামারী রোগ

ম্যালেরিয়া, ম্যালেরিয়ার লক্ষণ বুঝবেন কি করে, কিভাবে চিকিৎসা করবেন, ম্যালেরিয়া কিভাবে প্রতিরোধ করবেন, টাইফয়েড জ্বর, টাইফয়েড জ্বরের লক্ষণ, টাইফয়েডের চিকিৎসা, টাইফয়েড প্রতিরোধের উপায়, কলেরা, কলেরার লক্ষণ, কলেরার চিকিৎসা, কলেরা প্রতিরোধ করবেন কিভাবে।

বিংশ অধ্যায়

বয়স্ক লোকদের কিছু রোগ ও তার ঘরোয়া চিকিৎসার পদ্ধতি

আরথ্রাইটিস, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্ট্রোক, স্ট্রোকের লক্ষণগুলো, জরুরী কর্তব্য (যারা অজ্ঞান হয়ে পড়েন তাদের ক্ষেত্রে), ডায়াবেটিস কি, ডায়াবেটিসের লক্ষণ বুঝবেন কি করে, কাদের ডায়াবেটিস বেশি হয়, ডায়াবেটিস হলে সাধারণত কি ধরনের জটিলতা হয়ে থাকে, ডায়াবেটিস থেকে নিজেকে কিভাবে মুক্ত রাখা যায়, জরুরী অবস্থা, এ অবস্থায় আপনার কি করণীয়, ডায়াবেটিস বেড়ে গেলে আর এক ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় (এ ধরনের সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয় সাধারণতঃ), এ সমস্যায় করণীয় (ডায়াবেটিস থেকে যাতে জটিলতার সৃষ্টি না হয়), যারা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত তাদের জন্য কিছু পরামর্শ, উচ্চ রক্তচাপের

www.banglainternet.com

লক্ষণ (বিভিন্ন অঙ্গের লক্ষণ বোঝার উপায়), উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের কিছু ঘরোয়া প্রতিকার, হৃৎপিন্ডের অসুখ ও করণীয়, হৃদপিন্ডের অসুখে উপসর্গগুলো, হার্ট অ্যাটাক রুখবেন কি করে, হার্টের রোগী যদি বাড়িতে থাকে তবে কিছু নিয়ম বাড়ির লোকদের জানা একান্ত প্রয়োজনীয়।

একবিংশ অধ্যায়

দেহের ছোটখাটো কিছু উপসর্গ নিরাময়ে ম্যাসেজের ভূমিকা

মাথা ব্যথা, মাথা ব্যথার কারণ, টেনশনের মাথা ব্যথার লক্ষণ, মাইগ্রেণ বা মাথা ধরার লক্ষণ, মাইগ্রেণের তীব্রতা বৃদ্ধির কতগুলো কারণ বা ট্রিগার ফ্যাক্টর আছে, মাথা ব্যথায় কি ধরনের ম্যাসেজ কার্যকরী, কিভাবে ম্যাসাজ করবেন, মাথা ব্যথা এড়াবেন কিভাবে, গর্ভাবস্থায় ম্যাসেজের প্রয়োজনীয়তা (পেট ম্যাসেজ, পিঠের নিম্নাংশ ও নিতম্বের ম্যাসেজ, উরু ম্যাসেজ), প্রসবের পরবর্তী ম্যাসেজ, পিঠের ব্যথা ও ঘাড়ের ব্যথা, কাঁধ এবং পিঠের ম্যাসেজ কিভাবে করবেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

কিভাবে সুস্থ থাকবেন এবং জীবনকে উপভোগ করবেন তার কিছু ঘরোয়া টিপ্‌স্

রোগ নিরাময়ে শরীর চর্চা (মেদ কেন জমে? মেদ জমা কি কোনও ধরনের অসুস্থতা? শরীরে মেদ বৃদ্ধিতে করণীয়, মেদ বৃদ্ধিতে খাওয়া দাওয়ার বিশেষ ভূমিকা) টেনশন কি, কারা বেশি টেনশনে ভোগেন, টেনশন মুক্তির কয়েকটি উপায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

প্রশান্তিময় ঘুমের কয়েকটি উপায়

সুখনিদ্রার পরিমাণ (ঘুমের নির্দিষ্ট সময় মেনে চলুন, ঘুমের ওষুধ খাবার অভ্যাস ত্যাগ করুন, ঘুম আসছে না কেন ভেবে ঘাবড়াবেন না), যদি খাদ্যের কারণে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে থাকে (অতিরিক্ত মশলাযুক্ত খাবার খাবেন না, রাতের বেলা কম খাবার গ্রহণ, খাদ্যের এলার্জি, মাঝরাতে ক্ষুধার্ত বোধ করা, ওজন যাতে না বাড়ে সেজন্য উপবাস থাকা, রক্তে শর্করা কম থাকার কারণে, কফি কিংবা মদে আসক্ত হবেন না), নিয়মিত হাঁটার সুফল (হাঁটলে কি উপকার হয়, হাঁটার ফলে পেটের উপকার, মাথার উপকার, হাড়ের উপকার, ফুসফুসের উপকার, হৃদপিন্ডের উপকার)।

www.banglainternet.com

চতুর্বিংশ অধ্যায়

অপুষ্টির শিকার হলে ছেলেমেয়েদের কি কি সমস্যা হতে পারে

বেশি অপুষ্টির শিকার হলে, খাদ্যগ্রহণে কুসংস্কার থেকে অপুষ্টি (শৈশবকালে, অসুস্থ হলে, গর্ভাবস্থায়, প্রসবের পরে, অন্যান্য অবস্থায়), প্রতিকার, শিশুদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন, জন্মগত ত্রুটি রোধ করুন এবং সুস্থ শিশুর জন্ম দিন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

রোগ এড়ানো এবং রোগ সারানোতে পানির উপযুক্ত ব্যবহার

ষড়বিংশ অধ্যায়

ভ্রমণে শারীরিক বিড়ম্বনা এড়ানোর উপায়

বেড়াতে গেলে কি কি সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন (হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যাওয়া, শরীরের কোনও অংশ হঠাৎ কেটে বা ছিঁড়ে যাওয়া), পেটের বিভিন্ন সমস্যা (ডায়রিয়া, বদহজম, ফুড এলার্জি কিংবা স্কিন এলার্জি), কোষ্ঠকাঠিন্য, কারও যদি নির্দিষ্ট রোগ থেকে থাকে তা বেড়ে যাওয়া, অনিদ্রা, রোদে পোড়া, ফাংগাস ইনফেক্শন, বমি হওয়া, শিশুদের সঙ্গে নিয়ে যখন বেড়াতে যাবেন, যদি খুব বেশি মশা থাকে কিংবা ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত এলাকা হয়ে থাকে, যদি কোনও রকম পোকামাকড় কামড়ায়, ঘামাচি হলে কি করবেন, বেড়াতে যাবার পূর্বে আপনার যা করা উচিত, ভ্রমণের জন্য কিছু টুকিটাকি উপদেশ।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

মেয়েদের কয়েকটি মানসিক সমস্যা ও তার চিকিৎসা

মহিলাদের গর্ভকালীন মানসিক সমস্যা, চিকিৎসা, মাসিক-পূর্ব মানসিক সমস্যা, কি কি লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, চিকিৎসা, প্রসবের পরবর্তী মানসিক সমস্যা, এ রোগের লক্ষণ সমূহ, চিকিৎসা, রজবন্ধ বা মেনোপজ জনিত মানসিক সমস্যা, চিকিৎসা, গর্ভ নিরোধ বড়ি কিংবা বন্ধ্যাকরণ, গর্ভাবস্থার পরিসমাপ্তির সাথে মানসিক সমস্যা, অস্ত্রপচার দ্বারা জরায়ুর অপসারণে মানসিক সমস্যা।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কয়েকটি নিরাপদ নীতি

সবশেষে আপনার জন্য ১০টি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ।

www.banglainternet.com

Goto List >

প্রথম অধ্যায়

দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা এবং চিকিৎসক

দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা

মানব জীবন দুর্ঘটনাবহুল, প্রতিটি মানুষের জীবনে ছোটখাটো দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটা বিচিত্র কিছু নয়।

এই ধরনের আকস্মিক দুর্ঘটনায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার পাওয়া সব সময় সম্ভবপর হয় না। রোগীর জীবন রক্ষার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যারা এগিয়ে আসেন তাদেরকেই বলা হয় প্রাথমিক চিকিৎসক এবং উপযুক্ত চিকিৎসা পাওয়ার পূর্বমুহূর্তের পরিচর্যাকে বলা হয় প্রাথমিক চিকিৎসা।

এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে দৌড় ঝাপ, কাটাছেঁড়া এবং রেল, সড়ক, নৌ ও প্লেন দুর্ঘটনা ইত্যাদি থেকে। এছাড়া বন্যা, ভূমিকম্প, আগুন, পানি ইত্যাদির মাধ্যমেও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসক

যে কোনও সাধারণ লোকই প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যাপারে শিক্ষা লাভ করতে পারেন। প্রতিটি মানুষেরই প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান থাকা উচিত। যদিও প্রাথমিক চিকিৎসক একজন পূর্ণ চিকিৎসক নন তবুও তিনি তার কর্তব্যবোধ ও উপযুক্ত বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা দুর্ঘটনায় আহত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে দেশ ও দশের উপকার করতে পারেন।

প্রাথমিক চিকিৎসকের গুণাবলী

১। একজন প্রাথমিক চিকিৎসকের যে কোনও পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকতে হবে।

২। কোনও অবস্থায় মাথা গরম করা যাবে না। সকল পরিস্থিতিতে ধীর-স্থির, কুশলী, দক্ষ ও সাহসী হতে হবে।

www.banglainternet.com

Goto List >

৩। আহত ব্যক্তির বন্ধু বান্ধব কিংবা আত্মীয় স্বজনকে সহানুভূতির সঙ্গে আত্মবিশ্বাস যোগাতে হবে।

৪। আহত ব্যক্তিদেরকে উদ্ধারের সাথে সাথে নিজের নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৫। আইন শৃঙ্খলা যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৬। বড় কোনও দুর্ঘটনা হলে বিচলিত না হওয়া।

৭। আত্ম বিশ্বাসী হতে হবে।

প্রাথমিক চিকিৎসকের কর্তব্য

১। প্রথমেই কোন্ কোন্ বিষয়ে অগ্রগণ্য সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২। রোগীকে দুর্ঘটনা কবলিত স্থান থেকে উদ্ধার করতে হবে।

৩। রোগীর শ্বাসরুদ্ধ হলে কৃত্রিমভাবে শ্বাসক্রিয়া চালাতে হবে।

৪। রক্তপাত হতে থাকলে তা দ্রুত বন্ধ করতে হবে।

৫। রোগীর আত্মীয় স্বজনকে খবর দেবার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬। এ্যাম্বুলেন্স কিংবা যে কোনও যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে নতুবা নিকটে কোন ডাক্তার থাকলে অবিলম্বে ডাক্তার ডেকে আনতে হবে। অথবা নিকটস্থ হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে।

৭। আহতদের মনে সাহস যোগাতে হবে।

৮। আহতদের নিকট থেকে জনতার ভীড় কমাতে হবে। কারণ ভীড় বেশি হলে সেখানে অক্সিজেনের অভাব হয়, তাতে রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে।

৯। সাহায্য প্রদানকারী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহ যেমন– ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ, আনসার ইত্যাদিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খবর দিতে হবে এবং তাদের কাজে সহযোগিতা করতে হবে।

১০। রোগীর দেহের অভ্যন্তরে কোনও রূপ Internal হেমারেজ হয়েছে কি-না তা দেখতে হবে।

১১। রোগীর মাথায় আঘাত লেগে কন্‌কাশন হয়েছে কি-না দেখতে হবে।

১২। রোগী শক্ পেয়েছে কি-না তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৩। রোগী সম্বন্ধে মোটামুটি একটি তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, যেমন– রোগীর নাম, ঠিকানা, সময়, তারিখ, যানবাহনের নম্বর, দুর্ঘটনার স্থান ইত্যাদি।

১৪। রোগীর মৃগী কিংবা হিস্টিরিয়া প্রভৃতি রোগ আছে কি-না দেখতে হবে।

১৫। সবশেষে রোগীর মালামাল ও টাকা পয়সা হেফাজত করে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

www.banglainternet.com

কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসকের কাজের সীমাবদ্ধতা

১। প্রাথমিক চিকিৎসককে সব সময় মনে রাখতে হবে যে, সে একজন ডাক্তার নয়, সুতরাং কোনও লোককে মৃত বলে ঘোষণা করার ক্ষমতা তার নেই।

২। জটিল চিকিৎসা করার ক্ষমতা তার নেই।

৩। অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে রোগীকে বিরক্ত না করা।

৪। নিজের ক্ষমতার বাইরে কোনও রূপ ডাক্তারী বিদ্যা জাহির না করা।

প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য

১। দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তির জীবন রক্ষা করা।

২। রোগীর অবস্থার যাতে অবনতি না ঘটে সেজন্য তাৎক্ষণিক শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩। শক্ প্রতিরোধ করা এবং যদি হয়েই যায় তার প্রতিবিধান করা।

৪। বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে চিকিৎসাকে সহজতর করে তোলা এবং সেই সাথে ঠিক সময়মত চিকিৎসা পাওয়ার ব্যবস্থা করা।

৫। দুর্ঘটনায় কবলিত কোনও ব্যক্তি যেন অবহেলা ও অচিকিৎসায় মৃত্যুবরণ না করে।

৬। রোগীকে হাসপাতালে অথবা ডাক্তারের কাছে শীঘ্র নেওয়ার ব্যবস্থা করা।

৭। যতক্ষণ পর্যন্ত হাসপাতালে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভাব্য চিকিৎসা প্রদান করা।

দুর্ঘটনার কারণ

মানুষের জীবনে বহু ধরনের দুর্ঘটনাই ঘটতে পারে। যেমন–

১। সড়ক দুর্ঘটনা।

২। পুড়ে যাওয়া বা বার্ণিং।

৩। পানিতে ডোবা।

৪। সান্ স্ট্রোক্ বা হিট্ স্ট্রোক।

৫। ভূমিকম্প।

৬। নৌকা বা লঞ্চ ডুবি।

৭। সাইক্লোন কিংবা টর্নেডো।

www.banglainternet.com

৮। রেল দুর্ঘটনা।

৯। খনি কিংবা কারখানায় অগ্নিকাণ্ড।

১০। জনতার মধ্যে সংঘর্ষ।

১১। বোমা বিস্ফোরণ।

১২। বিষক্রিয়া বা বিষ খাওয়া।

১৩। ইলেকট্রিক শক্, মানসিক শক্ ইত্যাদি।

১৪। বড় দালান কোঠা ভেঙ্গে পড়া।

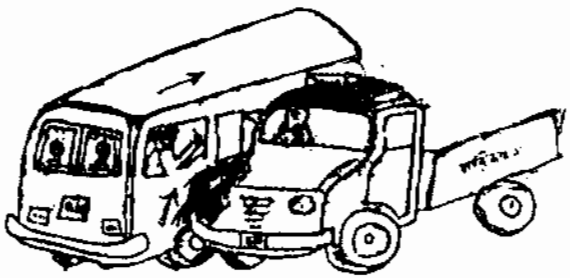

www.banglainternet.com

Goto List >

দ্বিতীয় অধ্যায়

রোগীর শুশ্রূষা প্রণালী বা নার্সিং

রোগীর শুশ্রূষাকারীকে অনেকগুলো গুণের অধিকারী হতে হবে। রোগীর চিকিৎসার সাথে সাথে নার্সিংও যেন ঠিকমত করা হয়। নার্সের যদি নিতান্তই অভাব হয় তবেই সাধারণ লোক দ্বারা চিকিৎসা করা যেতে পারে–নতুবা নয়। শুশ্রূষাকারীকে কর্তব্যজ্ঞান, ধৈর্য্য, সহানুভূতি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

শুশ্রূষাকারী বা নার্স

নার্স এর কাজ যদি নিকট আত্মীয় স্বজন করে থাকে তবে সবচাইতে ভাল হয়, তবে নার্সিং-এর বিষয়ে তাদের জ্ঞান থাকতে হবে। যদি না থাকে তবে তাদেরকে নির্দেশ বা শিক্ষা দান করতে হবে।

নার্সিং এর কাজ যারা করবেন তাদের মনে যথেষ্ট সাহস রাখতে হবে। কোনও রকম কঠিন সংক্রামক রোগে যেন শুশ্রূষাকারী ভীত না হন। এ সময় পোষাক যত কম পরা যায় ততই ভাল। পোষাক পরিচ্ছদ ঢিলেঢালা হওয়া উচিত, রোগীর কক্ষ থেকে বাইরে আসার সময় তা পরিবর্তন করা উচিত। এ সব ব্যাপারে সাবধান থাকলে রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা কম থাকে। এছাড়াও পরিচ্ছন্নতা, ধৈর্য্য ও সহানুভূতি ইত্যাদিও শুশ্রূষাকারীর ভেতরে পরিপূর্ণভাবে থাকতে হবে। এছাড়াও আরও কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যেমন– নখ, চুল ইত্যাদিও পরিপাটি রাখতে হবে।

রোগীর শয়নকক্ষ

১। রোগীর ঘর সর্বদা প্রশস্ত ও আলো বাতাসপূর্ণ হবে। ঘরটি বাড়ির অন্যান্য ঘরগুলো থেকে স্বাস্থ্যকর হতে হবে। কারণ, ঘর যদি শুকনো, তাপযুক্ত এবং প্রশস্ত না হয় এবং যদি স্যাঁতস্যাঁতে ভাব থাকে তবে রোগী এমনিতেই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

www.banglainternet.com

২। রোগীর ঘরের এক কোণে একটি তাক কিংবা টেবিল রাখা উচিত যেখানে অনায়াসে ওষুধ পত্র, কাগজ, কলম ইত্যাদি রাখা যায়।

৩। কোনও ছোঁয়াচে রোগ হলে যেমন– কলেরা, বসন্ত, হাম ইত্যাদিতে রোগীকে একটি আলাদা কক্ষে রাখা উচিত সেই কক্ষে লোকজন যত কম যাতায়াত করবে ততই মঙ্গলজনক হবে।

৪। যে সকল রোগীর চোখের সমস্যা আছে কিংবা ধনুষ্টংকারের রোগী– এদেরকে অন্ধকার ঘরে রাখতে হবে কিন্তু ঘরটি প্রশস্ত হতে হবে। যেন, রোগী নিজেকে বন্দী বলে না ভাবতে পারে।

৫। রোগীর শয্যার পাশে এককোণে হাত ধোয়ার সাবান, তোয়ালে গামছা ইত্যাদি রাখার ব্যাবস্থা থাকবে, সেই সাথে উপযুক্ত স্থানে একটি ঘড়িও রাখতে হবে। যেন সময়ানুযায়ী রোগীকে ওষুধ এবং পথ্য খাওয়ানো যায়।

৬। ঘরটি দিনে দুই তিনবার জীবাণুনাষক ওষুধ ছিটিয়ে ধুতে হবে। বিছানাপত্র পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখতে হবে। ঘরের কোণে ময়লা আবর্জনা ফেলার পাত্র রাখতে হবে এবং সেই পাত্রে ওষুধ ছিটিয়ে দিতে হবে।

রোগীর শয্যার স্থান

১। রোগীর শয্যার স্থান ঘরের মাঝখানে হওয়াই উত্তম। এতে করে যারা রোগীর সেবা যত্ন করেন তাদের চলা ফেরায় সুবিধা হয়।

২। প্রয়োজন মতো এবং প্রতিদিনই রোগীর বিছানার চাদর পরিবর্তন করে দিতে হবে। মাঝে মাঝে এগুলো রোদে দিলে রোগ জীবাণু মুক্ত হয়। এজন্য কয়েকটি বিছানার চাদর রাখা উত্তম।

৩। রোগীর বিছানার চাদর, মশারী, জামাকাপড় ইত্যাদি পরিষ্কার করে ধুয়ে শুকিয়ে রাখতে হবে।

৪। যে সব রোগী বিছানায় মলমূত্র ত্যাগ করে এদের শয্যার নিচে রবার-ক্লথ দিতে হবে।

৫। কোন্ ধরনের রোগীকে কি ধরনের শয্যা পেতে দিতে হবে তা বুঝতে হবে।

রোগীর জন্য কোন্ কোন্ ধরনের জিনিসপত্র আবশ্যক

রোগীর ঘরে অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র থাকবে। অনাবশ্যক এমন কোনও জিনিস রাখা উচিত নয় যা রোগীর শুশ্রূষাকারীর চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

www.banglainternet.com

Goto List >

কি কি জিনিস রাখবেন

১। থার্মোমিটার।

২। রোগীর থালা, বাটি, গ্লাস ইত্যাদি।

৩। প্রস্রাব পায়খানা করার পাত্র।

৪। রোগীর রবার-ক্লথ, তোয়ালে, বালিশ ইত্যাদি।

৫। রোগীর সাবান, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট ইত্যাদি।

৬। হট ওয়াটার ব্যাগ, আইস ব্যাগ।

৭। ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য পাত্র।

৮। রোগীর ব্যবহার্য কাপড় রাখার জন্য প্লাস্টিকের বালতি।

৯। রোগীর শরীরের তাপমাত্রা এবং ওষুধ পত্রের রিপোর্ট রাখার জন্য খাতা কলম।

নার্সিং-এর ক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা

কথায় বলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রোগ নিরাময় করে থাকে। যে লোক স্বভাবতঃ নোংরা থাকে তার ওপর রোগীর নার্সিং-এর ভার দিলে রোগ কমে না বরঞ্চ বেড়ে যায়। রোগীর বিছানাপত্র রোগীর দেহ ইত্যাদি সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে রোগী নিজেকে অনেকটা সুস্থ মনে করে এবং রোগ যন্ত্রণাও অনেকটা কমে।

ইসলাম ধর্মে একটি কথা আছে যে, 'পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ'। শুধু মাত্র পরিচ্ছন্নতার জন্য আল্লাহকে লাভ করা যায় কি-না তা জানা নেই। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য– মনকে পরিচ্ছন্ন না রাখলে আল্লাহকে পাওয়া যায় না। মনকে শুদ্ধ রাখতে হলে দেহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে। দেহ পবিত্র না হলে মন পবিত্র হতে পারে না। পরিচ্ছন্ন থাকলে রোগ জীবাণু বাড়তে পারে না। এজন্য রোগীর পোষাক পরিচ্ছদ, আসবাব পত্র, বিছানাপত্র ইত্যাদি সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত।

সাধারণ রোগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যতটা প্রয়োজন, সংক্রামক রোগে আরও বেশি পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত।

আমাদের গ্রাম দেশে কলেরা, হাম, বসন্ত ইত্যাদি হলে রোগীকে খুব সাবধানে রাখা হয়। এই পরিচ্ছন্নতার জন্য রোগ যেমন এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ছড়াতে পারে না, তেমনি রোগীর দেহ পরিচ্ছন্ন রাখলে রোগ সারা শরীরে ছড়াতে পারে না। পরিবারের কেউ একজন যদি অসুস্থ হয়, তবে অন্যান্যদের উচিত রোগীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া। এতে রোগ আর

www.banglainternet.com

দশজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। যেমন– স্কুলে পড়ে এমন শিশুর যদি হাম হয় তবে তার অসুখ সেরে যাওয়ার পরেও কিছুদিন তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ রাখতে হবে। এতে করে আর দশটা শিশু সংক্রামক রোগ থেকে রেহাই পাবে। একজনের এসব রোগ হলে পরিবারবর্গ, মহল্লার এমনকি সভ্য সমাজের নজর রাখা একান্তভাবে কর্তব্য।

নিষ্ঠাবান হওয়া

নার্সিং পেশার একটি বিরাট অঙ্গ হলো নিষ্ঠা ও কর্তব্যজ্ঞান। এ দুটো জিনিস যার মধ্যে নেই তিনি আর যাই করেন একজন ভাল নার্স হতে পারেন না। নার্সের কর্তব্য হতে হবে নিখুঁত। এ কথা মনে রাখতে হবে যিনি কর্তব্য কাজে অবহেলা করেন তিনি নার্সিং পেশায় অযোগ্য। রোগীকে সারিয়ে তোলার সংকল্প নিয়েই নার্সকে এগিয়ে যেতে হবে। রোগীকে সারিয়ে তুলতে হলে নিম্নোক্ত কাজগুলো শুশ্রূষাকারীকে নিষ্ঠার সাথে করতে হবে। যেমন–

১। রোগীকে সময়ানুযায়ী ওষুধপত্র খাওয়ানো।
২। রোগীকে পথ্য দেওয়া।
৩। নিয়মিত তাপগ্রহণ ও তা লিখে রাখা।
৪। নাড়ীর গতি দেখা ও লিখে রাখা।
৫। ইনজেক্শন দেওয়া।
৬। প্রস্রাব পায়খানার প্রয়োজন হলে তা সময়মত করানো।
৭। রোগীর পানির পিপাসা পেলে পানি পান করানো।
৮। রোগীর দুর্বলতা ও ভয় দূর করা।
৯। রোগীর সাথে সব সময় সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলা।
১০। আর্থিক ব্যাপারে বেশি ভাবা উচিত নয়। রোগী কিভাবে সুস্থ হবে সেই কামনা করা।

নার্সের নিষ্ঠার অভাব হেতু অন্যান্য গুণও চাপা পড়ে যেতে পারে। তাই নিষ্ঠাবান হওয়া নার্সের কর্তব্য।

ধৈর্য্য ও সহানুভূতিশীল হওয়া

শুশ্রূষাকারীকে অসীম ধৈর্য্যের অধিকারী ও সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। শুশ্রূষাকারী যদি ধৈর্য্য অবলম্বন না করে কথাবার্তা ও ব্যবহারে দুর্বলতা প্রকাশ

www.banglainternet.com

Goto List >

করে তবে রোগী হতাশ হয়ে পড়তে পারেন। শুধু শুশ্রূষাকারীই নয় রোগীর আত্মীয় স্বজনকেও যথেষ্ট ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। অনেক সময় রোগীর আত্মীয় স্বজন রোগ আরোগ্য লাভে দেরী হলে পরামর্শ দিয়ে চিকিৎসক পরিবর্তন করিয়ে থাকেন। এতে তারা রোগকে বাড়িয়ে তুলে, অভিভাবক বা পরিজনের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি করে থাকেন। এদের বোঝা উচিত যে, এমন কিছু রোগ আছে, যার, নির্দিষ্ট ভোগকাল শেষ না হলে রোগ সারে না।

আবার কিছু কিছু রোগীও আছেন বেশ অধৈর্য্য। মনে রাখা উচিত যে, ধৈর্য্যের অভাব হলে রোগীর ক্ষতি হবে। তাদের বোঝা উচিত যে, রোগ হলে যন্ত্রণা হওয়াটা স্বাভাবিক। এ সময় বেশি অস্থির হলে চিকিৎসকের চিকিৎসা উল্টোপাল্টা হয়ে যেতে পারে। রোগী যদি মানসিকভাবে বেশি অস্থির হয়ে পড়েন, তবে তার সাথে আত্মীয় স্বজন, শুশ্রূষাকারী সকলেই বিচলিত হয়ে পড়তে পারেন।

রোগী বহুদিন একই গৃহে, একই শয্যায় এবং একই নার্সের অধীনে থাকার জন্যই রাগী ও খিটখিটে হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে শুশ্রূষাকারীকে প্রচুর ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। অনেকদিন ধরে রোগীর সেবা শুশ্রূষা করার জন্য বিরক্ত হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু তা মুখমণ্ডলে ও কথাবার্তায় প্রকাশ পেলে রোগীর ওপরে তার প্রতিক্রিয়া ঘটে। মনে রাখা উচিত, রোগ নিরাময় হওয়ার পেছনে যথেষ্ট মনের প্রভাব থাকে। এজন্য নার্সকে অবশ্যই ধৈর্য্য অবলম্বন করে কাজ করতে হবে। রোগীর কিছু আত্মীয় স্বজন থাকেন এরা অল্পতেই হতাশ হয়ে পড়েন। এ ধরনের লোককে রোগীর কাছে আসতে দেওয়া উচিত নয়। রোগীর আত্মীয় স্বজন, রোগী, শুশ্রূষাকারীও চিকিৎসক সকলেরই প্রচুর ধৈর্য্য থাকতে হবে। নচেৎ রোগীর অকল্যাণ ও ক্ষতি হতে পারে।

নার্সিং

শুশ্রূষাকারীর লেখাপড়া জানা উচিত। শিক্ষিত নার্স দ্বারা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করানো যায়। যেমন– রোগীর কেস হিস্ট্রি লেখানো যায়। রোগীকে ইনজেক্শন দেওয়ানো যায়, ডুস দেওয়ানো যায়, ক্যাথেটার দেওয়ানো ইত্যাদি আরও বহু প্রয়োজনীয় কাজও শিক্ষিত নার্স দ্বারা করানো যায়।

অনভিজ্ঞ লোক দ্বারা সেবা করালে রোগ যন্ত্রণা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

www.banglainternet.com

নার্সিং-এর ক্ষেত্রে যে সব নিয়ম মানা উচিত

১। রোগীর প্রতিদিনের শরীরের উত্তাপ, মল, মূত্র, নাড়ী, শ্বাস ইত্যাদি লক্ষণ একটি খাতায় লিখে রাখতে হবে।

২। রোগী যাতে পূর্ণ বিশ্রাম পায় সেদিকে নার্সের পূর্ণ দৃষ্টি দিতে হবে।

৩। সময়মত রোগীকে পথ্য দিতে হবে।

৪। রোগীর মল, মূত্র, থুথু ইত্যাদি যেন যেদিকে সেদিকে না ছড়ায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৫। রোগীর ব্যবহৃত কাপড় চোপড় পুকুরের পানিতে ধোয়া উচিত নয়। এতে করে মহামারী প্রকট আকার ধারণ করতে পারে। এজন্য প্রথমেই কাপড় চোপড় জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

৬। প্রতি ৩, ৪, ৬ ঘণ্টা অন্তর রোগীর শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করতে হবে। শ্বাস প্রশ্বাস দেখতে হবে। প্রেসার পরীক্ষা করতে হবে। রোগীর মল-মূত্র ত্যাগ এবং ঘুম ইত্যাদি ঠিকমত হচ্ছে কি-না সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

৭। জ্বরের সময় ঠিকমত শরীর স্পঞ্জ করতে হবে।

নার্সিং-এর ক্ষেত্রে যে শিক্ষাগুলো বিশেষ প্রয়োজনীয়

কিভাবে মাথা ধোয়াবেন

মাথা ধোয়ানোর সময় রোগীর ঘাড়ের নিচে একটি রবার-ক্লথ দিতে হবে যেন পিঠের দিকে পানি না যায়। নিচে একটি গামলা কিংবা বালতি দিতে হবে যেন পানি রবার-ক্লথের মাধ্যমে গড়িয়ে গিয়ে বালতিতে পড়ে। মাথা যখন ধোয়ানো শেষ হবে তখন তোয়ালে দিয়ে ভালভাবে মাথা মুছে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, চুলে যেন বেশি পানি আটকে না থাকে। পানি বেশি থাকলে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।

রোগীর নাড়ী দেখার পদ্ধতি

ঘড়ির কাঁটা এক মিনিটে একবার ঘুরে আসতে যতটা সময় নেবে ততক্ষণে নাড়ী কতবার Beat করেছে তা দেখে Pulse Rate বোঝা যায়।

ডান হাতের কব্জির বৃদ্ধাঙ্গুলির নিচে সামনের দিকে চাপ দিলে Radial Pulse পাওয়া যায়। সেকেণ্ডের কাঁটাযুক্ত ঘড়ির সাহায্যে Pulse Rate বুঝতে হবে। সুস্থ লোকের নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ৭২ থেকে ৮০ বার পর্যন্ত হয়। এর চেয়ে দ্রুত কিংবা ধীরে নাড়ী চললে ধরে নিতে হবে রোগী পুরোপুরি সুস্থ নয়।

www.banglainternet.com

কিভাবে শরীরের তাপ নেবেন

রোগীর শরীরে সাধারণত তাপ গ্রহণ করতে হলে থার্মোমিটারের পারার অংশ বগল কিংবা জিহ্বার নিচে দিতে হবে। থার্মোমিটার লাগাবার পূর্বে ঝাঁকি দিয়ে নিয়ে পারদ স্তম্ভকে ৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে নামিয়ে নিতে হবে। তারপর এক মিনিট জিহ্বার নিচে কিংবা বগলের নিচে লাগিয়ে তাপ কতটা উঠলো তা দেখে নিতে হবে।

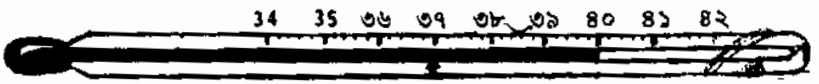

শ্বাস প্রশ্বাস পরীক্ষা করার নিয়ম

একজন সুস্থ লোকের সাধারণ শ্বাসের গতি প্রতি মিনিটে ১৮ থেকে ২০ বার হয়। রোগীকে শুইয়ে তার বুকের ওপর হালকা কোনও ধাতু দিয়ে রাখলে শ্বাস নিতে থাকলে ঐ ধাতু কতবার ওঠানামা করছে তা দেখতে হবে। নাড়ীর গতি যদি মিনিটে ১৮ থেকে ২০ বার এর বেশি হয় তবে শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত গতিতে বইছে বুঝতে হবে।

আইস ব্যাগ কিভাবে প্রয়োগ করবেন

আইস ব্যাগে বরফ ঢুকাতে হলে মাঝারী আকারের বরফ নিতে হবে। ব্যাগ খালি থাকতেই বাতাস বের করে নিয়ে যতটা সম্ভব বরফ দিয়ে ব্যাগ ভর্তি করতে হবে। ব্যাগের বাইরে যদি ভিজে ওঠে তবে তা মুছে নিতে হবে। বরফ গলে পানি হয়ে গেলে তা ফেলে দিতে হবে। এরপর চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী মাথায়, কপালে, ঘাড়ে ও পেটে আইস ব্যাগ দিতে হবে।

www.banglainternet.com

হট ওয়াটার ব্যাগ দেবার পদ্ধতি

হট ওয়াটার ব্যাগে গরম পানি ঢুকাতে গেলে ব্যাগের কিছু অংশ খালি রেখে পানি ঢুকাতে হয়। ব্যাগের মুখ দিয়ে যখন ভালভাবে বাষ্প বেরিয়ে যাবে তখনই ব্যাগের মুখ বন্ধ করতে হবে। ব্যাগের উত্তাপ বেশি হলে রোগী তা সহ্য করতে পারবে না। তাই প্রথমে উত্তাপ পরীক্ষা করে ব্যাগের মধ্যে কাপড় পেঁচিয়ে দিতে হবে। ক্রমান্বয়ে ব্যাগ ঠাণ্ডা হয়ে আসলে কাপড় খুলে দিতে হবে। ডাক্তারের নির্দেশ মতো প্রয়োজনীয় স্থানে সেঁক দিতে হবে।

প্রেসার পরীক্ষা করা

রক্তচাপ দুই ধরনের হয়। হৃদপিন্ডের চাপে রক্ত সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়লে তাকে সিস্টোলিক প্রেসার বলে। আবার যখন রক্ত হৃদপিণ্ডে ফিরে আসে ঐ সময় হৃদপিণ্ড প্রসারিত হয় বিধায় চাপ কম পড়ে তখন তাকে ডায়াস্টোলিক প্রেসার বলে। পূর্ণ বয়স্ক একজন সুস্থ লোকের সিস্টোলিক ১২০ এবং ডায়াস্টোলিক ৮০ থাকে। সাধারণত ডায়াস্টোলিক চাপ ৯০ এর বেশি হলে আমরা তাকে হাই প্রেসার বলে থাকি। সাধারণ অবস্থায় সিস্টোলিকের থেকে ডায়াস্টোলিক প্রেসার প্রায় ৪০ এর মতো কম হয়। বয়স অনুযায়ী প্রেসার কমে বাড়ে। বয়সের সঙ্গে ৯০ যোগ করলে তা হবে স্বাভাবিক সিস্টোলিক চাপ এবং ডায়াস্টোলিক তার চেয়ে ৪০ কম হবে। যেমন একজন ৪৫ বছরের লোকের স্বাভাবিক প্রেসার হবে—

৪৫+৯০ = ১৩৫ সিস্টোলিক

১৩৫−৪০ = ৯৫ ডায়াস্টোলিক

যদি প্রেসার এর চেয়ে বেশি কিংবা কম হয় তবে বুঝতে হবে লোকটি রোগগ্রস্থ।

রোগীকে স্পঞ্জ করানো

প্রথমে রোগীর মাথা ধোয়াতে হবে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে। তারপর হাত, বুক, পিঠ এবং সবশেষে পা প্রভৃতি স্পঞ্জ করতে হবে।

স্পঞ্জ করার সময় ঘরের দরজা জানালা ঠিকমত বন্ধ করতে হবে। স্পঞ্জ করার সময় গামছা বা তোয়ালে পানিতে ভিজিয়ে ভাল করে নিংড়ে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, পানি যেন খুব বেশি গরম বা ঠাণ্ডা না হয়। স্পঞ্জ করার সঙ্গে সঙ্গে আবার শুকনো গামছা বা তোয়ালে দিয়ে মুছে দিতে হবে। কোনও কোনও রোগের ক্ষেত্রে গরম পানির সাথে সামান্য লবণ মিশিয়ে স্পঞ্জ করা হয়।

www.banglainternet.com

তৃতীয় অধ্যায়

পুড়ে যাওয়ার চিকিৎসা

ত্বক সম্পর্কে কিছু কথা

আমাদের জীবন রক্ষার্থে ত্বকের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। ৩০% ত্বক নষ্ট হয়ে গেলে জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। আমাদের দেহের বহিরাবরণ এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ত্বকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পোড়াও এক ধরনের আঘাত। এতে ত্বকের মধ্যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। পোড়ার ফলে মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকৃতি ঘটতে পারে। এর ফলে মানুষ অন্ধ ও বধির হয়ে যেতে পারে। সেজন্য পোড়া রোগীর চিকিৎসা অতিদ্রুত হওয়া উচিত।

আমাদের ত্বকের প্রধানত ২টি স্তর থাকে–

১। উপচর্ম ২। অন্তচর্ম।

উপচর্মের আবার ৪টি স্তর থাকে। ত্বকের বিভিন্ন কোষ, গ্রন্থি ও কলা থাকে। তার মধ্যে প্রধানত হচ্ছে– ১। লোম, ২। লোমকূপ, ৩। ঘর্মগ্রন্থি, ৪। তৈলগ্রন্থি, ৫। রক্তনালী, ৬। লসিকানালী, ৭। স্নায়ু।

পোড়া ২ প্রকার

১। পোড়া ২। ঝলসে যাওয়া।

পোড়ার কারণ

১। আগুনের মধ্যে পড়ে গেলে।

২। পরিধেয় বস্ত্রে আগুন লেগে গেলে।

৩। কোনও রাসায়নিক দ্রব্য– এসিড বা ক্ষার থেকে।

৪। ফুটন্ত তরল পদার্থ থেকে যেমন– তেল, পানি বা বাষ্প, আলকাতরা, পিচ প্রভৃতি।

৫। বোমা বিস্ফোরণ হলে।

৬। ঘর বাড়ি কিংবা যানবাহনে অগ্নিকাণ্ডের ফলে।

৭। দ্রুত ঘূর্ণনশীল বস্তু কিংবা ঘর্ষণের ফলে।

www.banglainternet.com

৮। উত্তপ্ত ধাতব পদার্থ দ্বারা।
৯। বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা জনিত কারণে।

লক্ষণ

প্রথমে দেহের চামড়া লাল হয়ে যায়। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় পোড়ার পরিমাণ ও গভীরতা সহজে নির্ণয় করা যায় না।

দেহের পোড়া অংশকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়

১। ত্বকের বাহিরের অংশ পোড়া গেলে তাকে অগভীর পোড়া বলে।

২। ত্বকের সঙ্গে যদি মাংসপেশী পোড়া যায় তবে তাকে গভীর পোড়া বলে।

৩। দেহের ত্বকের আক্রান্ত অংশকে শতকরা হিসাবে ভাগ করা হয়। যেমন– শিশুদের ক্ষেত্রে ১০% পোড়া গেলেই গুরুতর পোড়া বলে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে ১৫% পোড়া গেলে গুরুতর পোড়া বলে।

গভীর ও অগভীর পোড়ার লক্ষণ কিভাবে বুঝবেন

যে সকল রোগী খুব বেশি পরিমাণে পোড়ে এদের ত্বকে জ্বালা ও বেদনার সৃষ্ট হয় এবং ত্বকের বহিরাবরণ উঠে গিয়ে শ্বেতবর্ণ ধারণ করতে পারে। এই সময় শরীরের তরল পদার্থ ক্ষতস্থান দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ফলে রোগীর শক্ ও মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়।

অগভীর পোড়ায় ত্বক লালবর্ণ হয়ে ফোস্‌কা পড়তে পারে। সেই সাথে জ্বালা ও ব্যথা হয়ে ফুলে যেতে পারে।

www.banglainternet.com

আগুনে পোড়া রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা

১। আগুনে পোড়া রোগীকে প্রথমেই আগুন থেকে উদ্ধার করতে হবে। উদ্ধারকারীর নিজের জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে তার নিজের জীবন যেন বিপন্ন না হয়।

২। পোড়া রোগীর পরিধেয় বস্ত্র যদি ত্বকের সাথে আটকে যায় তবে তা খোলার ব্যবস্থা করা উচিত নয়। তবে যদি এসিড কিংবা ক্ষার দ্বারা পোড়া যায় তবে তা সরিয়ে ফেলা উচিত। নচেৎ এতে করে এসিড কিংবা ক্ষার দ্বারা পোড়ার অংশ আরও বেড়ে যেতে পারে।

৩। পোড়া যদি খুব বেশি গভীর না হয় তাহলে জ্বালা ও বেদনা কমানোর জন্য ঠান্ডা পানিতে ১০/১২ মিনিট ডুবিয়ে রাখলে ভাল হয়। এছাড়া বরফ পট্টি দেওয়া যেতে পারে। ভিনিগার দিয়ে ধুলেও জ্বালা যন্ত্রণা কমে যায়।

৪। কারও পরিধেয় বস্ত্রে যদি আগুন ধরে তবে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ছুটাছুটি করতে না দিয়ে লেপ, কাঁথা কিংবা কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ধরতে হবে। মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কিংবা পানি ঢেলে দিলেও আগুন নিভে যায়। তবে পানি দিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা না করাই উচিত। এতে করে ঘা বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

৫। পরিষ্কার কাপড়, গজ বা তুলা দিয়ে ব্যান্ডেজ করতে হবে, সংক্রমণ যাতে না ছড়াতে পারে এবং তরল পদার্থ শরীর থেকে বেশি বের না হতে পারে। সবচাইতে ভাল হয় পলিথিন দিয়ে যদি ক্ষতস্থান ঢেকে রাখা যায়।

৬। আমাদের গ্রাম দেশে পোড়া স্থানে ডিমের কুসুম, ছাই ইত্যাদি লাগানো হয়। কিন্তু এগুলো ক্ষতস্থানে লাগানো উচিত নয়।

৭। যদি কেরোসিন কিংবা পেট্রোলজনিত অগ্নিকান্ড ঘটে তবে পানি দিয়ে আগুন নেভাতে গেলে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

৮। ফোস্‌কা পড়লে তা কখনও গালতে হয় না। এতে করে দেহের তরল পদার্থ বেরিয়ে যাবে এবং দেহে সংক্রমণ ঘটবে।

৯। শক্ প্রতিরোধ করতে হবে।

রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা পুড়ে যাওয়া রোগীর কি ব্যবস্থা করবেন

রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা পোড়ার ঘটনা বিরল নয়। সাধারণত ল্যাবরেটরীতে কাজ করার সময় এ জাতীয় ঘটনা ঘটে থাকে। এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে চেহারার

www.banglainternet.com

বিকৃতি ঘটতে পারে। অন্ধ কিংবা বধির হয়ে মৃত্যুবরণ করার ঘটনাও বিরল নয়। দুষ্কৃতিকারীরা অস্ত্র হিসাবে এসিড কিংবা ক্ষারও ব্যবহার করে থাকে।

১। রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা যদি পুড়ে যায় তবে প্রথমেই প্রচুর পানি দ্বারা আক্রান্ত স্থান ধুতে হবে।

২। পরিধেয় বস্ত্র তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে অন্য কোনও পরিষ্কার বস্ত্র দিয়ে দেহ ঢাকতে হবে।

৩। রোগীকে পানি দুধ ও অন্যান্য পানি জাতীয় তরল খাবার খেতে দিতে হবে।

৪। যত শীঘ্র সম্ভব হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে।

৫। চোখে লাগলে হাত দিয়ে চোখ না কচলে পরিষ্কার পানি দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলতে হবে। খুব সাবধানে চোখ ধুতে হবে যেন মুখমন্ডলে কিংবা শরীরের অন্যস্থানে না লাগে। এরপর পরিষ্কার নরম কাপড় দিয়ে ড্রেসিং করে যতশীঘ্র সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত।

আগুনে পোড়া কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়

১। রান্নার পর চুলার আগুন নিভিয়ে ফেলতে হবে। কেরোসিনের চুলা ও স্টোভ কিংবা হিটারে সাবধানে রান্না বান্না করতে হবে।

২। গ্যাস ও বিদ্যুতের লাইন মাঝে মধ্যে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

www.banglainternet.com

৩। গৃহে ও কলকারখানায় আগুন ও বিদ্যুতের ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে।

৪। শিশুদেরকে আগুনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত।

৫। শিশুদেরকে কখনও আগুন কিংবা দিয়াশলাই নিয়ে খেলতে দেওয়া উচিত নয়।

৬। উত্তপ্ত তেলের কড়াইয়ে যদি আগুন ধরে যায় তবে পানি না দিয়ে ঢাকনা দিয়ে চাপ দিতে হবে।

৭। দিয়াশলাইয়ের কাঠি, বিড়ি সিগারেট থেকেও বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড ঘটে থাকে। সুতরাং এগুলো যেখানে সেখানে ফেলা যাবে না।

৮। ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি ও ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, পানি গরম করার হিটার, ফ্রিজ ইত্যাদি সাবধানে ব্যবহার করতে হবে।

৯। ভূ-গর্ভস্থ কক্ষ, নর্দমা, কূপ ইত্যাদিতে গ্যাস ভর্তি থাকে, প্রজ্জলিত আগুন নিয়ে এসব কক্ষে প্রবেশ করা ঠিক নয়।

১০। ব্রিক ফিল্ডে ইট পোড়ানোর সময় খুব সতর্ক থাকা উচিত।

১১। আগুন থেকে উদ্ধারকারী দলকে কিভাবে উদ্ধার করতে হবে সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে নতুবা উদ্ধারকর্মীর নিজেরই জীবন বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে।

www.banglainternet.com

চতুর্থ অধ্যায়

পানিতে ডোবার চিকিৎসা

আমাদের দেশে পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। পানিতে পড়ে গেলে। শ্বাসনালী ও ফুসফুসের ভেতরে পানি ঢুকে যায়। ফলে পানিতে পড়া ব্যক্তি প্রচুর পানি খেয়ে ৫/৬ মিনিটের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করে থাকে।

পানিতে ডুবে মৃত্যুর কারণগুলো

১। সাঁতার জানা না থাকলে পুকুর, নদীতে কিংবা গভীর কোনও জলাশয়ে পড়ে গেলে।

২। নৌ দুর্ঘটনার জন্য।

৩। সড়ক দুর্ঘটনা হয়ে যানবাহন যদি পানিতে পড়ে যায়।

৪। বন্যার পানিতে পড়ে গেলে, কিংবা নদী ভাঙ্গনের সময়।

৫। জলোচ্ছ্বাসের সময়।

৬। অসাবধানতার বশে শিশু যদি পানিতে পড়ে যায়।

পানিতে ডোবা ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা কিভাবে করবেন

কথায় বলে, যে সব লোক পানিতে ডোবে তারা হাতের কাছে যাই পায় তাই আঁকড়িয়ে ধরে। সে যত ক্ষুদ্র খড় কুটোই হোক না কেন। তাই–

১। পানিতে ডোবা ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে হলে পারদর্শী লোকের প্রয়োজন নতুবা উদ্ধারকারীর জীবন বিপন্ন হতে পারে।

২। লাইফ লাইন ছুঁড়ে পানি থেকে উদ্ধার করতে হবে।

৩। উদ্ধারকারীর সাঁতার জানা না থাকলে ব্যক্তিকে ঠেলে ঠেলে তীরের দিকে ফিরে যেতে হবে। তা না হলে ব্যক্তি উদ্ধারকারীকে জড়িয়ে ধরে উদ্ধারকারীর জীবন বিপন্ন করে তুলবে।

www.banglainternet.com

৪। পানিতে ডুবলে প্রথমে হা কারয়ে জিভ টেনে বের করে আনতে হবে। পরে মুখের মধ্যে থেকে কিংবা নাক থেকে লালা শ্লেষ্মা প্রভৃতি বের করে দিতে হবে।

৫। ব্যক্তির শ্বাসনালী ও ফুসফুস সম্পূর্ণভাবে পানিতে পূর্ণ থাকলে সেই পানি বের করতে হবে। প্রথমে ব্যক্তিকে উপুড় করে শুইয়ে দিতে হবে। এরপর পেট ধরে উঁচু করতে হবে যাতে মাথা ও বুক নিচের দিকে থাকে। পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় দিতে হবে। এতে করে ধীরে ধীরে পাকস্থলী, শ্বাসনালী ও ফুসফুসের পানি বেরিয়ে যাবে।

৬। ভেজা কাপড় সঙ্গে সঙ্গে খুলে শুকনো কাপড় পরিয়ে দিতে হবে।

৭। এরপর স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস চালিয়ে যেতে হবে।

৮। আবার ব্যক্তির পায়ের দিকটা উঁচু করে ধরে মাথা নিচু করে বুকে-পেটে হালকা চাপ দিলে মুখ দিয়ে পানি বেরিয়ে আসবে।

৯। পানি বের হয়ে যাবার পর ব্যক্তিকে গরম চা, দুধ ইত্যাদি খেতে দিতে হবে।

১০। প্রয়োজনে ঠাণ্ডা হলে গরম সেঁক দিতে হবে।

১১। অতি সত্বর ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

www.banglainternet.com

Goto List >

পঞ্চম অধ্যায়

শ্বাসরোধ

বিভিন্ন কারণে শ্বাসরোধ হয়ে থাকে। কোনও দ্রব্য দ্বারা যদি শ্বাসনালী বন্ধ হয় তবে শ্বাসরোধ হয়ে থাকে।

শ্বাসরোধের কারণগুলো

১। নিঃশ্বাসে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে যেমন– কয়লা খনিতে, পুরনো কূপে।

২। খাদ্য দ্রব্য শ্বাসনালীতে আটকে গেলে।

৩। বাঁধানো দাঁত খুলে গলায় আটকে গেলে। বমি, রক্ত, মাংসের হাড়, মাছের কাঁটা ইত্যাদি গলায় আটকে গেলে।

৪। অজ্ঞান রোগী জিহ্বা উল্টে যদি পেছন দিকে পড়ে যায় তবে তার শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।

৫। পানিতে ডুবে গেলে।

৬। বৈদ্যুতিক শকের কারণে।

৭। দুর্ঘটনায় বুকে ক্ষত হলে।

৮। গলা টিপে হত্যা করলে কিংবা গলায় দড়ি দিলে।

৯। বুকের ওপর কোনও ভারী বস্তুর চাপ পড়লে, বুকে যদি কোনও বড় ধরনের আঘাত লাগে।

১০। দুর্ঘটনায় বড় ধরনের কোনও আঘাত লাগলে।

১১। বিষাক্ত ওষুধ সেবন করলে যেমন– মরফিয়া।

১২। বিভিন্ন রোগ ব্যধিজনিত কারণে– পোলিও ইত্যাদি।

১৩। বন্ধ ঘরে বাতি জ্বেলে ঘুমোলে অনেক সময় শ্বাসরোধ হয়। কারণ দহনের ফলে বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস জমা হয় এবং এতে করে শ্বাসরোধ হতে পারে।

১৪। মস্তিষ্কের শ্বাস প্রশ্বাস কেন্দ্র আঘাত প্রাপ্ত হলে।

www.banglainternet.com

শ্বাসরোধের প্রথম অবস্থার লক্ষণ

১। শ্বাস কষ্টকর এবং অনিয়মিত।
২। নাড়ী দ্রুত ও দুর্বল।
৩। রোগীর মূর্ছাভাব।
৪। রোগীর ঠোঁট, নাক, কান ইত্যাদি নীলাভ ভাব।
৫। রোগীর গলা ফুলে ওঠা।
৬। শ্বাস অনিয়মিত হবে– কখনও কম কখনও বেশি হবে।
৭। বিষাক্ত ওষুধের লক্ষণাদি ফুটে উঠবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা কিভাবে করবেন

১। যে সকল কারণে শ্বাসরোধ হচ্ছে তা দূর করতে হবে।
২। রোগীকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে।
৩। শ্বাস প্রশ্বাস যাতে স্বাভাবিক থাকে সেজন্য অবশ্যই শ্বাসনালী পরিষ্কার ও খোলা রাখতে হবে।
৪। শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে সাথে সাথে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস চালু করতে হবে।
৫। শক্ এড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে।
৬। শ্বাস প্রশ্বাসে কোনও বাধা থাকলে সে বাধা দূর করতে হবে।
৭। মুক্ত বায়ুর ব্যবস্থা করার জন্য লোকের ভীড় কমাতে হবে।
৮। দ্রুত মেডিকেল ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্বাসরোধের কারণগুলো কিভাবে দূর করবেন

১। শ্বাসনালীতে কোনও পদার্থ আটকে গেলে রোগী নিশ্বাস নিতে পারে না কিংবা কথা বলতে পারে না। মুখ নীলবর্ণ ধারণ করে ও রোগী Collapse করে। তাই সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

২। বন্ধ ঘরে বাতি দহনের ফলে যদি দম আটকে যায় তবে দরজা খুলে বা ভেঙ্গে ঢুকে রোগীকে বাইরে খোলা বাতাসে আনতে হবে।

৩। গলায় দড়ি দিলে দড়ি কেটে নিচে নামিয়ে এনে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। একজনের দ্বারা না হলে দুজনে মিলে করতে হবে।

www.banglainternet.com

শ্বাসরোধ হলে প্রাথমিক চিকিৎসা কিভাবে করবেন

১। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে এর প্রাথমিক অবস্থা দূর করতে হবে। টোকা মেরে, মৃদু ধাক্কা দিয়ে নাড়াচাড়া করে কিংবা চিৎকার করে রোগীর মধ্যে প্রাণের সঞ্চার ঘটাতে হবে।

২। সাহায্য করার জন্য চীৎকার দিয়ে লোক জড়ো করতে হবে।

শ্বাসনালীতে কিছু আটকে যদি দম বন্ধ হয়ে যায় তবে কি করবেন

(ক) মুখ ফাঁক করে গলায় আঙ্গুল দিতে হবে এরপর জিনিসটি বের করার জন্য বমি করাতে হবে। কিংবা ডান হাতের তর্জনী দিয়ে জিনিসটি বের করে আনতে হবে। এজন্য প্র্যাকটিস করা প্রয়োজন।

(খ) ঘাড় ও মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিতে হবে। ছোট ছেলেমেয়ে হলে পা ধরে ঝুলিয়ে দিতে হবে।

(গ) পিঠের দুটো পাখনা হাড়ের মাঝে জোরে টোকা দিতে হবে।

(ঘ) যদি রোগী অজ্ঞান থাকে তবে প্রথমে রোগীর পেটে চাপ দিতে হবে এরপর মুখ খুলে জিহ্বা ও নিচের চোয়াল একসঙ্গে ধরে জিহ্বাটি বাইরে বের করে আনতে হবে। মুখে কোনও পদার্থ থাকলে তাও বের করে ফেলতে হবে। শ্বাসনালীতে যেন বাতাস ঠিকমত চলাচল করে।

(ঙ) এ কাজ করার সময় টর্চ ব্যবহার করতে হবে, এরপর রোগীকে কাৎ করে শুইয়ে দিতে হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে পেটে চাপ দেওয়া কখনও উচিত নয়।

কিভাবে বুকে বা পেটে চাপ প্রয়োগ করা হয়

দাঁড়ানো অবস্থায় ঃ এই অবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসক রোগীর পেছনে দাঁড়াবে এরপর রোগীকে দাঁড় করিয়ে পেটে চাপ দিতে হবে। চাপ একবার বেশি দিলে আরেকবার কম দিতে হবে। এভাবে পেটে চাপ পড়লে রোগী বমি করে ফেলবে কিংবা তার স্বাভাবিক শ্বাসকার্য ফিরে আসবে।

শায়িত অবস্থায় ঃ এই প্রক্রিয়ায় রোগীকে চিৎ করে শোয়াতে হবে। এই অবস্থায় রোগীর পেট ব্যতিত দেহের অন্য কোনও স্থানে যেন চাপ না পড়ে, ধীরে ধীরে চাপ সৃষ্টি করতে হবে। এর মধ্যে একবার ঢিলা দিয়ে নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক করার চেষ্টা করতে হবে।

www.banglainternet.com

বিষাক্ত ধোঁয়ায় যদি শ্বাসরোধ হয়ে যায়

১। প্রথমেই বন্ধ ঘরের দরজা জানালা সব খুলে দিতে হবে।

২। এরপর লোকজন ডেকে এনে রোগীকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসতে হবে।

৩। কাছাকাছি হাসপাতাল থাকলে সেখানে অতি সত্বর রোগীকে স্থানান্তর করতে হবে।

৪। রোগীকে মুক্তবায়ু সেবনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে অক্সিজেন দিতে হবে।

৫। প্রাথমিক চিকিৎসক নিজেকে রক্ষা করে চলবেন।

৬। ভূ-গর্ভস্থ কোনও জলাধার কিংবা গর্ত, কুয়া ইত্যাদি থেকে রোগীকে উদ্ধার করতে হলে টর্চ জাতীয় জ্বলন্ত বাতি নিয়ে ঢুকতে হবে এবং Life line দিয়ে চলতে হবে।

৭। গ্যাস নিম্নগামী হলে দাঁড়িয়ে এগোতে হবে উর্ধগামী হলে গুড়ি মেরে এগোতে হবে।

৮। বিষাক্ত গ্যাসে নিশ্বাস নেওয়া যাবে না।

৯। বেশি রোগী থাকলে Life line সহ মুখোশ পরে এক একবার এক একজনকে উদ্ধার করতে হবে।

১০। রোগীকে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে শ্বাসরোধ হলে কি করবেন

১। প্রয়োজনে কৃত্রিম পদ্ধতিতে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। অজ্ঞান রোগীকে প্রথমে চিৎ করে শোয়াতে হবে। এরপর মুখ কাৎ করে শোয়ালে মুখ ও শ্বাসনালী খোলা থাকবে। যদি শ্বাসনালীতে বাধাপ্রদানকারী কোনও বস্তু থাকে তবে তা বের হয়ে যাবে।

৩। রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসলে রোগীকে রিকভারী পজিশনে রাখতে হবে।

৪। মুখ খোলা রাখতে হবে এবং জিহ্বা যথাস্থানে ঠিক থাকতে হবে। জিহ্বা উল্টে যাতে পিছনের দিকে না যেতে পারে সেজন্য নিচের চোয়ালের কোণে বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে সামনের দিকে চাপ প্রয়োগ করে মুখ খোলার চেষ্টা করতে হবে।

৫। যদি বোঝা যায় যে, রোগী ঘাড়ে আঘাত প্রাপ্ত তবে ঘাড় ও মাথা পেছনের দিকে বাঁকা না করে নিচের চোয়াল ধরতে হবে এবং মুখ খোলা রেখে জিহ্বা হাত দিয়ে ধরে যথাস্থানে রেখে মুখের ভেতরের অংশ পরিষ্কার করতে হবে। মুখ ও শ্বাসনালী যাতে পরিষ্কার ও খোলা থাকে সেদিকে দৃষ্টি থাকতে হবে।

৬। এয়ার ওয়ে টিউবের সাহায্যে জিহ্বাকে যথা স্থানে রাখা যায় এবং শ্বাসনালীও খোলা থাকবে।

৭। মাথায় কোনও গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হলে তৎক্ষণাত হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

www.banglainternet.com

কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসক্রিয়া চালানোর পদ্ধতি

বিভিন্ন কারণে রোগীর স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে কিংবা বন্ধ হতে পারে। এই সময়ে শ্বাস প্রশ্বাসের অনুকরণে রোগীর আবার স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস ফিরিয়ে আনাকে বলা হয় কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া।

কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের নানা উপায় চালু আছে। কৃত্রিম শ্বাস ক্রিয়া প্রাথমিক চিকিৎসক হাত দিয়ে করে থাকেন কিংবা চিকিৎসকও করতে পারেন। যন্ত্রের সাহায্যেও এটি করা যায়। কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের মূল উদ্দেশ্য হলো রোগীর ফুসফুসকে প্রতি মিনিটে ১০ থেকে ১২ বার ছোট ও বড় করা। এতে করে ফুসফুসে একবার বাতাস প্রবেশ করে ও একবার বের হয়। এভাবেই কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া চালানো হয়।

কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে কৃত্রিমভাবে শ্বাসক্রিয়া চালানো হয়

মুখের মধ্যে মুখ দিয়ে শ্বাস ক্রিয়া চালানো

এ পদ্ধতিতে প্রথমে রোগীকে চিৎ করে শোয়াতে হবে। এরপর রোগীর মুখ ফাঁক করে জোরে ফুঁ দিয়ে ও টেনে নিয়ে এ পদ্ধতি চালু করতে হবে। এ পদ্ধতিতে রোগীর মুখের ওপর পাতলা রুমাল বা কাপড় রেখে ফুঁ দিতে হবে। এ পদ্ধতিটি প্রতি মিনিটে ১২ থেকে ১৫ বার করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাভাবিক শ্বাস ক্রিয়া চালু না হয়। তবে এটি সব সময় কার্যকরী পদ্ধতি নয়। এ ধরনের শ্বাসক্রিয়া চালিয়ে যেতে হলে একাধিক সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়।

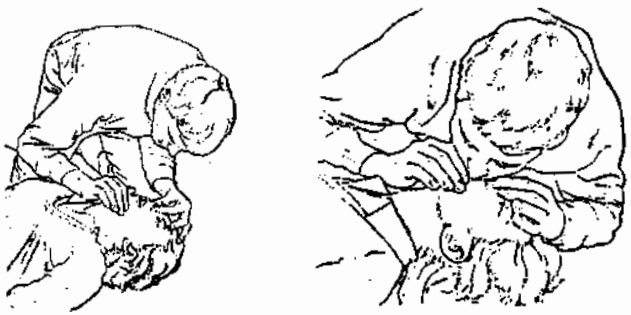

www.banglainternet.com

বুকের পেছন দিক দিয়ে কৃত্রিম পদ্ধতিতে শ্বাস ক্রিয়া চালানো

এ পদ্ধতিকে সেফারের প্রণালী বলা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে রোগীকে উপুড় করে শোয়াতে হবে। রোগীর মুখ থাকবে নিচের দিকে এবং মাথাকে একপাশে কাত করে দিতে হবে যাতে রোগীর দাঁত মুখ মাটিতে ঠেকে না থাকে। এরপর বক্ষ পিঞ্জরের পেছনে এবং মেরুদন্ডের দু'পাশে হাত রাখতে হবে। রোগীর কোমরের দু'পাশে হাত দুটি এমনভাবে রাখতে হবে যেন শির দাঁড়ার দু'পাশে নিজের দুটি কব্জি ছুঁই ছুঁই করে। নিজের হাত দুটো এবং কনুই সোজা রাখতে হবে। বুড়ো আঙ্গুল দুটোকে সামনের দিকে রাখতে হবে। হাতের চেটো ও অন্যান্য আঙ্গুলগুলো কোমরে আড়াআড়িভাবে দু'দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। নিজের কনুই যাতে না বেঁকে থাকে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সামনের দিকে ঝুঁকে তারপর চাপ দিতে হবে। চাপ দেওয়া ও ছাড়া ৫ সেকেণ্ডের মধ্যে শেষ করতে হবে। চাপ দেওয়াতে ৩ সেকেন্ড ও ছাড়াতে ২ সেকেণ্ড সময় নিতে হবে। যতক্ষণ স্বাভাবিক শ্বাস ক্রিয়া না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ পদ্ধতি চালিয়ে যেতে হবে। একজনের দ্বারা সম্ভব না হলে দ্বিতীয়জন এ পদ্ধতিতে কাজ করবে।

রোগীর পেট ও বুকের সংযোগ স্থলে চাপ দিয়ে কিভাবে শ্বাসক্রিয়া চালু করবেন

রোগীকে চিৎ করে শুইয়ে দিতে হবে। এরপর মাথা, ঘাড়, মুখ একদিকে কাত করে রোগীর পেটের ও বুকের পাঁজরের সংযোগস্থল চিকিৎসকের দুই হাত রেখে বুকের দিকে চাপ দিতে হবে। প্রতি মিনিটে ১২ থেকে ১৫ বার পর্যন্ত করতে হবে। স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া চালু না হওয়া পর্যন্ত এ পদ্ধতি চালিয়ে যেতে হবে।

www.banglainternet.com

সিল্‌ভেস্টার প্রণালীতে শ্বাস ক্রিয়া চালানো

এই প্রণালীতে রোগীকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে রোগীর ঘাড়ের নিচে বালিশ দিতে হবে। রোগীকে শুইয়ে দু'হাত দিয়ে সজোরে তার কনুই দুটি টেনে তুলে বুকের দু'পাশে রাখতে হবে যাতে বুকের দু'পাশে চাপ পড়ে। রোগীর মাথাটা যেন বালিশের বাইরে ঝুলে পড়ে। রোগীর জিহ্বা উল্টে যেন বাতাস বন্ধ না হয় সেজন্য জিহ্বা সামনে রাখার চেষ্টা করতে হবে। রোগীর দেহের জামাকাপড় খুলে দিতে হবে।

এই পদ্ধতিতে রোগীর বুকে রোগীর হাত দ্বারা চাপ সৃষ্টি করে কৃত্রিম পদ্ধতিতে শ্বাস ক্রিয়া চালু করতে হবে। প্রথম কাজটি ৩ সেকেন্ড এবং দ্বিতীয় কাজটি ২ সেকেন্ড মোট ৫ সেকেন্ড রোগীর শ্বাস ক্রিয়া স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এভাবে কৃত্রিম শ্বাস ক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে।

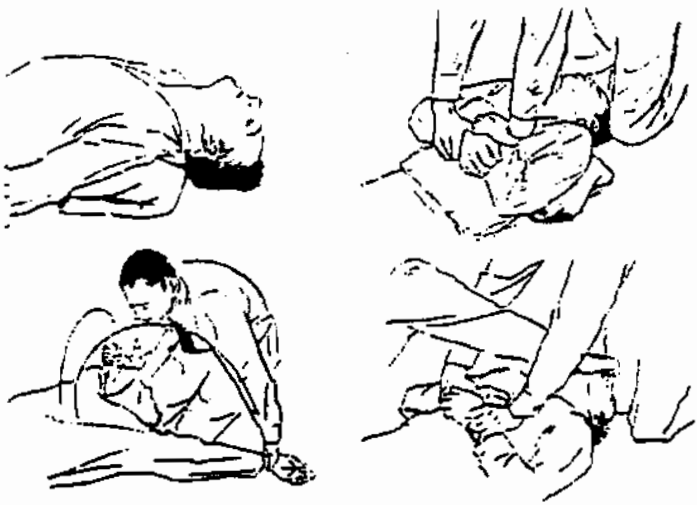

www.banglainternet.com

দাঁড়ানো অবস্থায় রোগীর বুকে চাপ দিয়ে শ্বাস ক্রিয়া চালানো

প্রাথমিক চিকিৎসক রোগীর পেছনে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে থাকা রোগীর বগলের তল দিয়ে দু'হাতে বুক ও পেটে চাপ সৃষ্টি করবে ও ছাড়বে। এ পদ্ধতি মিনিটে ১২ থেকে ১৫ বার করবে। এ পদ্ধতিতে শ্বাস ক্রিয়া ব্যতিত ফুসফুস ও খাদ্যনালীতে কিছু আটকে থাকলে তাও বের হয়ে যাবে।

বুকের মধ্যে চাপ দিয়ে শ্বাস ক্রিয়া চালানো

এক হাতের ওপর আরেক হাতের তালু রেখে বুকের ওপর চাপ দিতে হবে। প্রতি মিনিটে ১২ থেকে ১৫ বার করতে হবে। যখন চাপ সৃষ্টি করা হবে তখন ফুসফুসের বাতাস বের হয়ে আসবে এবং চাপ যখন ছেড়ে দেওয়া হবে তখন বাতাস শ্বাসনালীর মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করবে।

হোলজার নেলসন পদ্ধতি

১। এই পদ্ধতিতে রোগীকে উপুড় করে শোয়াতে হবে।

২। রোগীর ঘাড় ও মাথা কাত করে রোগীর হাতের ওপরই রাখতে হবে।

৩। প্রাথমিক চিকিৎসক রোগীর মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসবে।

৪। এরপর দু'হাত রোগীর পিঠে রেখে চাপ দিতে হবে।

৫। রোগীর বাহু দুটি ওঠানামা করাতে হবে। পুনরায় দু'হাতে পিঠে চাপ দিতে হবে।

৬। এ প্রক্রিয়া মিনিটে ১২ বার করতে হবে। সাহায্যকারীকে রোগীর চোয়াল ধরে এবং মুখ তুলে রেখে খোলা ও পরিষ্কার রাখতে বলতে হবে।

৭। সোল্ডার জয়েন্ট বা কাছাকাছি কোনও অস্থিভঙ্গ থাকলে এই প্রক্রিয়া চলবে না।

www.banglainternet.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

কুকুরের কামড়

কুকুরে কামড়ালে কখনও কখনও ভয়ের কিছু থাকে না। যদি কামড়ানো কুকুরটি গৃহপালিত সাধারণ কুকুর হয় তবে। কিন্তু কুকুরটি যদি পাগলা হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে এর জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। এই ধরনের কুকুরের লালায় জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাস থাকে। কুকুর, বেড়াল, শেয়াল, নেকড়ে, বেজী রেবিস ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে জলাতঙ্ক রোগের সৃষ্টি করে। এই ধরনের ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত পশুগুলো মানুষ কিংবা গৃহপালিত কোনও পশুকে কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়।

জলাতঙ্ক একটি মারাত্মক ব্যাধি। তাই এ ব্যাধি থেকে সাবধান থাকতে হবে। পাগলা কুকুরের কামড়ে যদি কোনও মানুষের জলাতঙ্ক হয় সেই মানুষের কামড়ে অন্য লোকেরও এই রোগ হতে পারে। পাগলা কুকুরের সামান্য আঁচড়েও এই রোগ হয় যদি ক্ষত লালা দ্বারা স্পর্শ পায়। এই ধরনের রোগী অবিরাম আর্ত চীৎকার করে, কামড়াবার চেষ্টা করে, লালা ঝরে এবং উন্মাদের মতো আচরণ করে।

প্রাথমিক চিকিৎসকের কিছু কর্তব্য

১। প্রথমেই খোঁজ নিতে হবে কুকুরটি পোষা কুকুর ছিল, না রাস্তার কুকুর ছিল।

২। যদি পোষা কুকুর হয় তবে গৃহকর্তার নিকট ঐ কুকুরের আচরণ অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে কি-না।

৩। যে কুকুর কামড় দিয়েছে তাকে বেধে রাখতে হবে। ডাক্তার দেখবেন কুকুরটি রোগগ্রস্থ কি-না। যদি কুকুরটি রোগগ্রস্থ হয় তবে ১০ দিনের মধ্যেই সেটির মৃত্যু হবে।

৪। কুকুরটি যদি ৫ থেকে ১০ দিনের মধ্যে মারা যায় তবে জলাতঙ্কের ইনজেক্শন দিতেই হবে।

৫। যদি বোঝা যায় যে কুকুরটি জলাতঙ্ক গ্রস্থ, তবে কুকুরটিকে মেরে তার ব্রেনটি অবিকৃত রাখতে হবে যাতে চিকিৎসক বুঝতে পারেন জন্তুটি সত্যিই রোগগ্রস্থ ছিল কি-না।

www.banglainternet.com

৬। জলাতঙ্ক গ্রস্থ কুকুর প্ররোচনা ছাড়াই কামড় দেয়। তাই দেখতে হবে কুকুরটি প্ররোচনা ছাড়া কামড় দিয়েছিল কি-না।

৭। জলাতঙ্ক গ্রস্থ কুকুরের মৃত্যুর পর তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে কারণ এই কুকুরের মাংস যদি অন্য কোনও প্রাণী খেয়ে থাকে তবে সেই প্রাণীও মৃত্যুবরণ করবে।

জলাতঙ্ক গ্রস্থ কুকুর চেনার উপায়

১। জলাতঙ্ক গ্রস্থ কুকুর সর্বক্ষণ ছোটাছুটি করে এবং যাকে কাছে পায় তাকেই কামড়াতে চায়।

২। রোগগ্রস্থ কুকুরের মুখ থেকে সর্বক্ষণ লালা ঝরতে থাকে সেই লালার সাথেই ভাইরাস নির্গত হয়।

৩। জলাতঙ্ক গ্রস্থ কুকুর সর্বক্ষণ ঘেউ ঘেউ করতে থাকে এবং খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়।

৪। পরবর্তীতে কুকুরের সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে এবং কুকুরকে অসুস্থ দেখায়।

৫। খিঁচুনী হয় এরপর নিস্তেজ হয়ে মৃত্যুবরণ করে থাকে

প্রাথমিক চিকিৎসা

১। কার্বলিক সাবান ও পানি দ্বারা আহত স্থানটি পরিষ্কার করতে হবে।

২। আহত অঙ্গটি যতদূর সম্ভব নিচে রাখতে হবে।

www.banglainternet.com

৩। রক্তপাত হলে তা বন্ধের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। এন্টিসেপটিক লোশন দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে এবং ড্রেসিং দিতে হবে।

৫। ক্ষতস্থানে ড্রাই ড্রেসিং ব্যবহার করতে হবে।

৬। হাসপাতালে নিয়ে দ্রুত ইনজেক্শন দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

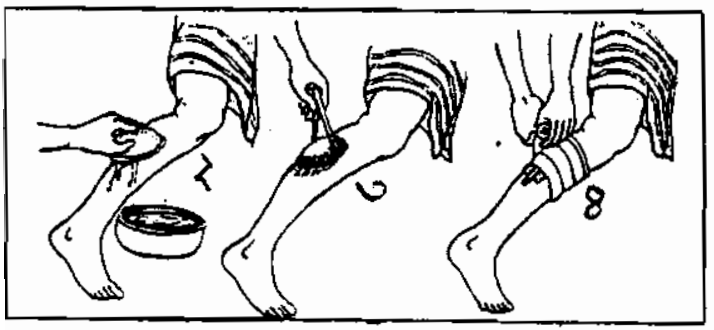

www.banglainternet.com

সপ্তম অধ্যায়

অচৈতন্য হওয়া (শক্)

মানব দেহের নার্ভাস সিস্টেম কোনও কারণে অতিরিক্ত উত্তেজিত হলে কিংবা কর্মহীন হয়ে পড়লেই শক্ বা অচৈতন্য অবস্থা ঘটে। রোগীর মধ্যে যখন অতি সামান্য জ্ঞান থাকে কিন্তু আচ্ছন্নভাব প্রবল থাকে তখন তাকে অর্ধ চৈতন্য অবস্থা বলে। রোগীর চেতনা যখন একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায় তখন তাকে পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থা বা কোমা বলে। অর্ধ চৈতন্য অবস্থায় যখন রোগী থাকে তখন রোগী কিছু কিছু কথার উত্তর দেয়, আচ্ছন্ন অবস্থা কখনও কম থাকে কখনও বেশি থাকে। একটুখানি চেষ্টা করলেই রোগীর আচ্ছন্নভাব কমে যায়।

রোগী যখন কোমা অবস্থায় চলে যায় তখন তার কোনও জ্ঞান থাকে না, দেহের কোনও অংশে আঘাত করলেও সাড়া পাওয়া যায় না।

কি কি কারণে রোগীর অচৈতন্য অবস্থার সৃষ্টি হয়

বিভিন্ন রোগের কারণে ঃ বিভিন্ন রোগের জন্য রোগী অচৈতন্য হয়ে পড়ে। যেমন– মৃগী, হিস্টিরিয়া, হার্টের করোনারী কিংবা মস্তিষ্কের সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস্ ইত্যাদি রোগে। এছাড়াও টাইফয়েড, কলেরা, নিউমোনিয়া, মেনিন্জাইটিস, ডায়াবেটিকের কোমা ইত্যাদি রোগের কারণে কোমার সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন দুর্ঘটনার কারণে ঃ সড়ক দুর্ঘটনায় রক্তক্ষরণ বেশি হলে, মাথায় কোনও ধরনের আঘাত প্রাপ্ত হলে, কোনও কারণে শ্বাসরোধ হলে কিংবা দুর্ঘটনায় প্রবল ভয় পেলেও অচৈতন্য অবস্থার সৃষ্টি হয়।

বিষক্রিয়া ঘটলে ঃ কেউ যদি মারাত্মক বিষ সেবন করে ফেললে, বেশি পরিমাণে মদ্যপান করলে কিংবা নেশা জাতীয় কোনও জিনিস যেমন– গাঁজা, আফিম ইত্যাদি বেশি পরিমাণে খেয়ে ফেললে অচৈতন্য অবস্থার সৃষ্টি হয়।

তাপমাত্রার কম বেশি হলে ঃ সান স্ট্রোক, হিট স্ট্রোক কিংবা প্রবল শৈত্য প্রবাহের কারণে।

www.banglainternet.com

রোগীর অচৈতন্য অবস্থার লক্ষণ ও চিহ্ন

১। রোগী সম্পূর্ণভাবে অচৈতন্য কিংবা অর্ধ অচৈতন্য থাকবে।

২। রোগীর নাড়ীর গতি দুর্বল ও দ্রুত হয় এবং সেই সাথে রক্তচাপ কমে যায়।

৩। মুখ রক্তাভ ও উত্তপ্ত হয়ে মুখমন্ডল ও শরীরে ঘাম দেখা দেয়।

৪। শ্বাস প্রশ্বাস অনিয়মিত ও কষ্টকর হয়।

৫। হাত, পা ও মুখ ফ্যাকাসে দেখায়।

৬। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে প্যারালাইসিস অবস্থার মতো হয়ে যায়।

৭। রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

৮। এই অবস্থায় রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

হিস্টিরিয়া জনিত শক্

১। হিস্টিরিয়া হলে রোগী মুখ বিকৃত করে থাকে, দাঁত খিঁচতে থাকে এবং সেই সাথে হাত পা ছোঁড়ে।

২। হিস্টিরিয়া সম্পূর্ণভাবে মানসিক কারণে ঘটে থাকে।

৩। কখনও রোগী ভীষণভাবে হাত পা ছোঁড়ে এবং দাঁত খিঁচতে থাকে।

৪। হিস্টিরিয়া আরম্ভ হলে বেশ কিছু সময় ধরে চলতে থাকে।

৫। সাধারণত যে সব যুবতী মেয়েরা মানসিক সমস্যায় ভোগে এদের ক্ষেত্রে এই রকম ঘটে থাকে।

প্রাথমিক চিকিৎসার পদ্ধতি

১। স্মেলিং সল্ট শুঁকতে দিতে হবে।

২। এসব ক্ষেত্রে রোগীর সাথে শক্ত আচরণ করতে হবে।

৩। সহানুভূতি থাকবে কিন্তু তা প্রকাশ করা যাবে না।

৪। রোগী সুস্থ না হলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

অতিরিক্ত মদ্যপান কিংবা নেশাজাতীয় কোনও জিনিসের কারণে অচৈতন্য হলে

১। এই অবস্থায় রোগী ঠিকমত চলাফেরা করতে পারে।

২। রোগী অপ্রকৃতিস্থ থাকে।

www.banglainternet.com

৩। কথাবার্তায় অসংলগ্নতার প্রকাশ ঘটে।

৪। অসৌজন্যসূচক আচরণ করে।

৫। কোনও অসংলগ্ন আচরণ করে থাকলে পরবর্তীতে আর তা মনে থাকে না।

৬। চলাফেরায় একটা এলোমেলো ভাব আসে।

৭। অচৈতন্য ভাব আসতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসার পদ্ধতি

১। মদ্যপান বেশি করলে বমি করাতে হবে।

২। অধিক নেশাগ্রস্থ হয়ে বিষক্রিয়া ঘটলে বিষক্রিয়ায় সাধারণ ফার্স্ট-এড করতে হবে।

৩। অবস্থা বেগতিক দেখলে অতি দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে।

মৃগী রোগী অচৈতন্য হলে

মৃগী রোগীকে দেখে সুস্থ মনে হলেও মৃগী রোগ থেকে ফিট পর্যন্ত হয়ে যায়। অনেকে সপ্তাহ, দিন, মাস কিংবা মাসের তফাতেও ফিট হয়ে যায়। জন্মের সময় যদি মগজের কোনও ক্ষতি হয়, শিশু অবস্থায় অধিক জ্বর কিংবা মগজে ফিতা কৃমির সিস্ট থেকেও মৃগী রোগ হয়। এটি কোনও ছোঁয়াচে রোগ নয়। এটি স্নায়ুমন্ডলীর রোগ। তবে পিতৃ কিংবা মাতৃকুলে এই রোগ থাকলে এই রোগের সম্ভাবনা বেশি থাকে। এই রোগ হলে হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। অজ্ঞান হয়ে যাবার পূর্বে রোগীর মাথা ঘুরতে থাকে, দৃষ্টি শক্তি অস্পষ্ট হয়ে মাথা ঝিম ঝিম করে ও কান ভোঁ ভোঁ করে, সমস্ত দেহে পেশীর সংকোচন হয়।

মৃগী রোগের লক্ষণ ও চিহ্ন

১। মৃগী রোগীর ঘাড় শক্ত হয়ে যায়।

২। কেউ কেউ এতে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে ভয়ানকভাবে হাত পা ছোঁড়ে।

৩। অনেক সময় রোগী মলমূত্র ত্যাগ করে ফেলে।

৪। জিভে কামড়ের আঘাত লেগে যায়।

৫। কখনও কখনও দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়।

৬। হাতের আঙ্গুল বেঁকে শক্ত হয়ে যায়।

৭। মুখমন্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করে।

৮। ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে লক্ষণগুলো কমে আসে।

www.banglainternet.com

মৃগীর ফিট হলে কি করণীয়

১। রোগীর মাথায় মুখে ঠাণ্ডা পানি দিতে হবে।

২। এক টুকরো কাঠ কিংবা ঐ ধরনের কোনও জিনিস পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুড়ে দু'পাটি দাঁতের মাঝ বরাবর দিতে হবে যাতে জিহ্বার মধ্যে কামড় না পড়ে।

৩। রোগীকে আগুন, পানি এবং ধারালো জিনিস থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

৪। ভীড় ঠেকাতে হবে যাতে অক্সিজেনের অভাব না হয়।

৫। রোগী যদি বমি করে ফেলে তবে মাথা একপাশে কাত করে দিতে হবে যেন দম বন্ধ হয়ে না যায় এবং শ্বাসনালী পরিষ্কার থাকে।

৬। রোগীকে প্রচুর চিনি মিশিয়ে চা দিতে হবে।

৭। ফিটের পরবর্তী সময় শরীরে নিস্তেজ ভাব আসতে পারে। তাই ঐ সময়টা রোগীকে বিশ্রাম দিতে হবে।

সন্ন্যাস রোগ

১। এ রোগ একটি সত্যিকারের মারাত্মক রোগ।

২। নানাভাবে রোগী এ রোগের পূর্বলক্ষণ বুঝতে পারে। কিছুক্ষণের মধ্যে রোগীর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

৩। সমস্ত শরীরে কাঁপুনির ভাব দেখা দেয়। ২/৩ মিনিট এ অবস্থা থাকার পর রোগী ঝিমিয়ে পড়ে।

৪। অনেক সময় রোগী অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

৫। জ্ঞান ফিরে আসতে অনেক সময় লাগে।

৬। অনেক সময় রোগী মৃত্যুবরণও করতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসার পদ্ধতি

১। রোগীকে সুস্থভাবে শুইয়ে দিতে হবে।

২। এ অবস্থায় রোগীর যাতে শারীরিক কোনও কষ্ট না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৩। অজ্ঞান অবস্থাতেই প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে এবং অক্সিজেন দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

www.banglainternet.com

কোনও দুর্ঘটনার কারণে স্নায়বিক শক্

১। কোনও কারণে যদি দেহে গুরুতর আঘাত লাগে তবে দেহের মধ্যে রক্তপাত জনিত শক্ ঘটে।

২। অনেক সময় দুর্ঘটনার জন্য প্রবল ভয়ে মানসিক শক্ হতে পারে।

৩। মাথায় আঘাত লাগার কারণেও শক্ হতে পারে।

৪। দেহের অভ্যন্তরে রক্তপাতের দরুনও শক্ হতে পারে।

৫। অনেক সময় নিজে সামান্য আহত হলেও অন্যের আঘাত দেখে নার্ভাস হয়ে শক্ হতে পারে।

৬। রোগের বিষের কারণেও শকের সৃষ্টি হতে পারে। যাকে বলা যায় টক্সিক শক্।

৭। কাটা পোড়া ইত্যাদির কারণেও মানসিক আঘাতের জন্য শক্ হতে পারে।

স্নায়বিক শক্ প্রাপ্ত হলে তার লক্ষণ

১। রোগীর মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে এবং তার নিজের দেহের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

২। শ্বাস প্রশ্বাস অনিয়মিত ও ক্ষীণ হয়।

৩। বমির ভাব কিংবা বমি হতেও পারে।

৪। রোগী মাঝে মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

৫। হাত পা শীতল হয়ে শরীর দিয়ে ঘাম বের হয়।

৬। নাড়ী দুর্বল হয়ে পড়ে।

এই ধরনের অবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসার পদ্ধতি

১। রোগীকে যথা সম্ভব সাহস যোগাতে হবে।

২। রোগীর কাপড় জামা ঢিলে করে দিতে হবে।

৩। রোগীকে সব সময় চিৎ করে শুইয়ে রাখতে হবে।

৪। রক্তপাত হচ্ছে কি-না দেখতে হবে।

৫। পাল্স্ রেইট দেখতে হবে।

৬। জনতার ভীড় ঠেকাতে হবে।

৭। দেহের উত্তাপ কমে গেলে প্রয়োজনে চাদর কিংবা কম্বল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

www.banglainternet.com

৮। শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ থাকলে কৃত্রিমভাবে শ্বাস প্রশ্বাস চালাতে হবে।

৯। রোগী জ্ঞান না হারালে এবং রক্তপাত না হলে গরম চা, কফি কিংবা দুধ খাওয়ানো যাবে।

১০। বেশি রক্তপাত হলে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

১১। দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে।

শক্ অবস্থায় কি কি করা অনুচিত

১। অজ্ঞান থাকলে খাদ্য দেওয়া যাবে না।

২। রক্তপাত জনিত শকে খাদ্য দেওয়া যাবে না।

৩। উত্তেজক জিনিস দেওয়া যাবে না।

৪। বেশি কম্বল বা চাদর দিয়ে ঢেকে ঘামানো যাবে না।

www.banglainternet.com

Goto List >

অষ্টম অধ্যায়

রক্তপাত এবং ক্ষত

কোনও কারণে দেহের কোনও টিস্যু যদি ছিন্ন হয়ে পড়ে, তবে তাকে ক্ষত বলা যেতে পারে। দেহে ক্ষত হলে রক্তপাত হতে পারে এবং দেহে জীবাণু সংক্রমণ ঘটতে পারে।'

বিভিন্ন কারণে মানবদেহে রক্তপাত হতে পারে। কোনও ধারাল অস্ত্র, ছুরি, ব্লেড বা ধাঁরালো কোনও জিনিস দ্বারা যদি কেটে যায়।

এই রক্ত প্রবাহ শিরা না ধমনী থেকে আসছে তা দেখতে হবে। ধমনীর রক্ত হয় টকটকে লাল এবং তা ফিনকি দিয়ে বের হতে থাকে। শিরার রক্ত হয় বেগুনি কিংবা কালচে এবং তা আস্তে আস্তে বের হতে থাকে।

ধমনীর থেকে যদি রক্ত বের হয় তবে কাটা মুখের উপর দিকে অর্থাৎ হৃদপিন্ডের দিকে জোর দিয়ে চেপে ধরতে হবে।

শিরা থেকে যদি রক্তপাত আরম্ভ হয় তবে ক্ষতস্থানের নিচের দিকে অর্থাৎ হৃদপিন্ডের বিপরীত দিকে চেপে ধরতে হবে। এরপর হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা কিভাবে করবেন

১। রোগীকে প্রথমে শুইয়ে দিতে হবে এবং নাড়াচাড়া কম করতে হবে। কারণ নাড়াচাড়া বেশি করলে রক্তপাত বেশি হবে।

২। ক্ষতস্থান এন্টিসেপটিক কোনও লোশন দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে।

৩। ক্ষতস্থান অনাবৃত রাখার চেষ্টা করতে হবে। কিছু কিছু রক্ত জমাট বেঁধে গেলেও তা সরানো উচিত নয় এতে করে রক্তপাত বেড়ে যাবে।

৪। ক্ষতস্থানের ভেতর যদি কিছু ঢুকে থাকে তবে তা আস্তে আস্তে বের করে ফেলতে হবে।

৫। কিন্তু যদি কোনও জিনিস শক্তভাবে ঢুকে থাকে তবে তা সরানো উচিত নয়। এতে করে রক্তপাত বেড়ে যেতে পারে।

৬। ক্ষতস্থানটি হৃদপিণ্ড বরাবর উপরে তুলে রাখতে হবে এতে করে রক্তপাত বন্ধ হবে।

www.banglainternet.com

৭। সাবধানে থাকতে হবে যেন ক্ষতস্থানে ধুলো বালি বা ময়লা না লাগে।

৮। প্যাড, গজ এবং ব্যাণ্ডেজ লাগিয়ে ড্রেসিং করে দিতে হবে।

রক্তপাত বেশি হলে বুঝবেন কিভাবে

১। রোগীর মুখ ও ঠোঁটে রক্তশূন্য ও ফ্যাকাশে ভাব আসবে।

২। রোগীর সমস্ত শরীরে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমবে।

৩। রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুতভাবে বইবে।

৪। নাড়ী দুর্বল হয়ে যাবে।

৫। অস্থিরতার সৃষ্টি হবে।

৬। শরীরের সমস্ত চামড়া ঠাণ্ডা ও স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যাবে।

৭। রোগীর মাথা ঘুরবে এবং রোগী পিপাসার্ত বোধ করবে।

৮। অনেক ক্ষেত্রে রোগীর শাস কষ্ট আরম্ভ হবে এবং রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

ক্ষত থেকে রক্তপাত বন্ধ করবার উপায়

১। আঘাত প্রাপ্ত স্থানটি উঁচু করে ধরে রাখতে হবে।

২। হাত দিয়ে কিংবা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরে রাখতে হবে যতক্ষণ না রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

৩। রক্ত পড়া যদি একেবারেই বন্ধ না হয় তবে ক্ষতস্থান চেপে ধরে রাখতে হবে।

৪। কাটা জায়গার খুব নিকটবর্তী স্থানে ফিতা কিংবা রুমাল দিয়ে শক্ত করে বাঁধতে হবে।

৫। বাঁধনের জন্য চওড়া ফিতা ব্যবহার করতে হবে। কখনও সরু দড়ি দ্বারা বাঁধা উচিত নয়।

www.banglainternet.com

সাবধানতা অবলম্বন করা

১। রক্তপাত যদি একেবারেই বন্ধ না হয় তবেই এ বাঁধন দিতে হবে নতুবা নয়।

২। রক্ত চলাচলে যাতে করে বিঘ্ন না ঘটে তার জন্য আধ ঘণ্টায় একবার বাঁধন একটু ঢিলা করে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পর পর দেখতে হবে রক্ত পড়া বন্ধ হলো কি-না। এই বাঁধন বেশি সময় ধরে রাখা যায় না।

৩। রক্ত বন্ধ করতে কেরোসিন, চুন ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নয়।

রক্তপাত বেশি হলে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পাবে

১। রোগী শীত শীত বোধ করবে।

২। রোগী অত্যন্ত পিপাসার্ত হবে।

৩। শ্বাসকষ্ট হবে।

৪। রোগী অকারণে ভয় পাবে।

৫। রোগীর নাড়ী অত্যন্ত দুর্বল ও দ্রুততর হবে।

৬। নিশ্বাস প্রশ্বাস অতিদ্রুত বইবে।

বিভিন্ন অঙ্গের রক্তপাত

নাক দিয়ে রক্তপাত

১। নাক দিয়ে রক্ত পড়া রোগীকে শোয়ানো যাবে না। বসিয়ে রাখতে হবে।

২। যতক্ষণ রক্তপাত বন্ধ না হবে ততক্ষণ দুই আঙ্গুলে নাক চেপে ধরে রাখতে হবে।

৩। নাকের ভেতরে তুলোর পুঁটলি গুঁজে দিতে হবে এবং পুঁটলির কিছুটা নাকের বাইরে যেন থাকে। যাতে তুলা খুলতে সুবিধা হয়।

৪। নাকের ভেতরে খোঁটা যাবে না কিংবা জমে যাওয়া রক্ত বের করা যাবে না। এতে পুনরায় রক্তপাত হতে পারে।

৫। নাক টিপে ধরার পরও যদি রক্ত বন্ধ না হয়, তবে সে যেন একটি ছিপি ভাঁজ করা ছোট ছোট কাপড় দাঁতে চেপে ধরে রাখে। ছিপিটি ঢোক গেলা বন্ধ রাখতে সাহায্য করে। এই সময়টুকুতে রক্তটা জমাট বেঁধে যাবার সময় পায়।

৬। রক্তপাত বন্ধ না হলে দ্রুত হাসপাতালে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

www.banglainternet.com

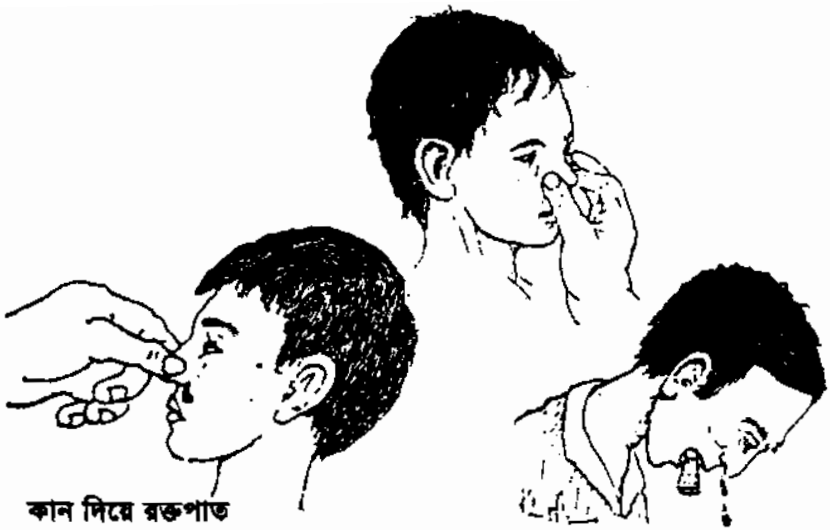

কান দিয়ে রক্তপাত

কান দিয়ে রক্তপাত হলে জমাট রক্ত সরানো উচিত নয়। কানে কোনও জিনিস ঢুকানো যাবে না। রোগীকে কাত করে শুইয়ে দিতে হবে বা বসিয়ে রাখতে হবে।

দাঁত দিয়ে রক্তপাত

দাঁতে কোনও রূপ ধাক্কা কিংবা আঘাত খেলে দাঁত দিয়ে রক্তপাত ঘটে। রক্তপাত যুক্ত দাঁতের Socket এ তুলোর একটি ছোট্ট প্লাগ ঠেলে দিয়ে তার ওপর প্রচুর পরিমাণে তুলো দিয়ে চেপে ধরে রাখতে হবে। রোগী থুথু ফেলতে পারবে না কিংবা মুখ ধুতেও পারবে না।

ছোটখাটো ক্ষত হতে অল্প রক্তক্ষণের প্রাথমিক চিকিৎসা

১। মানুষের শরীরে ছোটখাটো কাটা ছেঁড়া হয়ে ত্বকের ক্ষত থেকে রক্তপাত হলে প্রাকৃতিক নিয়মেই রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। যদি স্বাভাবিক নিয়মে না হয় তবে ড্রেসিং বা ব্যান্ডেজ দ্বারা রক্তপাত বন্ধ করতে হবে।

২। প্রথমে সাবান ও পরিষ্কার পানি দ্বারা ক্ষতস্থান ধুতে হবে। ক্ষতস্থানে যদি ময়লা, কাঁচ কিংবা বালুকণা থাকে তবে তা পরিষ্কার করতে হবে। এরপর পরিষ্কার হয়ে গেলে এন্টিসেপটিক লোশন ব্যবহার করতে হবে।

৩। গজ তুলা কিংবা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ড্রেসিং করতে হবে।

৪। ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

www.banglainternet.com

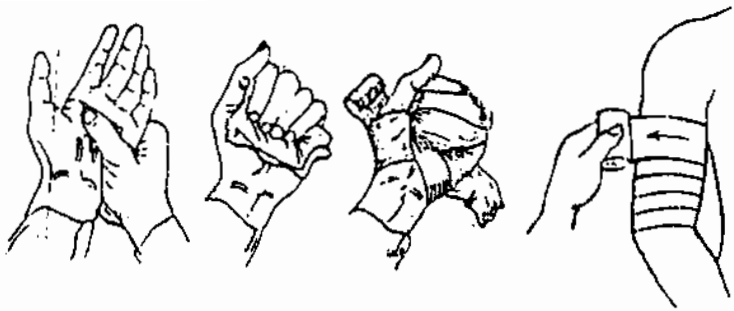

কিভাবে ড্রেসিং করবেন

মানুষের শরীরের কোনও স্থানে কেটে গেলে কিংবা ক্ষতের সৃষ্টি হলে সে স্থান পরিষ্কার করে গজ, তুলা, ব্যাণ্ডেজ কিংবা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে আবৃত করাকে ড্রেসিং বলে। ক্ষতস্থান পরিষ্কার করার জন্য পরিষ্কার পানি, সাবান, স্যালাইন পানি ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

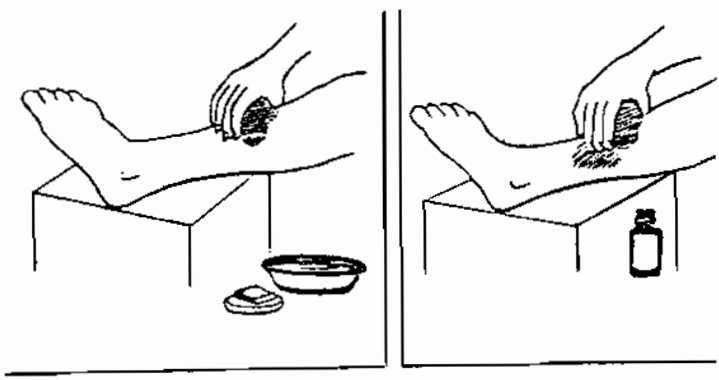

কেন ড্রেসিং করবেন

১। ড্রেসিং করার মূল উদ্দেশ্য হলো বাহির থেকে যাতে জীবাণু সংক্রমণ না ঘটে।

২। রক্তপাত যাতে বন্ধ করা যায়।

৩। রক্ত কিংবা পুঁজ ইত্যাদি শুষে নেবার জন্য।

৪। ক্ষতস্থান যাতে নিরাপদে থাকে, আরামপ্রদ ভাবে থাকে এবং অতিসত্বর ঘা শুকোতে পারে।

www.banglainternet.com

বিভিন্ন ধরনের ড্রেসিং

জীবাণুমুক্ত ড্রেসিং ঃ এ ধরনের ড্রেসিং বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এ ড্রেসিং-এ গজ, তুলা ব্যাণ্ডেজ পূর্বেই জীবাণুমুক্ত করে রেখে দেওয়া হয়। ড্রেসিং করার পূর্বে সাবান পানি দিয়ে হাত ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। ড্রেসিং যথাস্থানে রাখার জন্য রোলার ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা যেতে পারে।

জরুরী ড্রেসিং ঃ মানুষের জীবনে আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনের সময় জীবাণুমুক্ত ড্রেসিং পাওয়া যায় না। এজন্য সব সময় পরিষ্কার নরম কাপড়, গামছা, রুমাল ইত্যাদি হাতের কাছে রাখা ভাল। কারণ ড্রেসিং-এর ক্ষেত্রে নোংরা কাপড় ব্যবহার করা মোটেও উচিত নয়।

এডহেসিভ ড্রেসিং ঃ ছোটখাটো কাটা ছেঁড়ার জন্য আজকাল বাজারে জীবাণুমুক্ত ড্রেসিং যেমন– মেডিএইড, মেডিপ্লাস্ট ইত্যাদি ড্রেসিং কিনতে পাওয়া যায়।

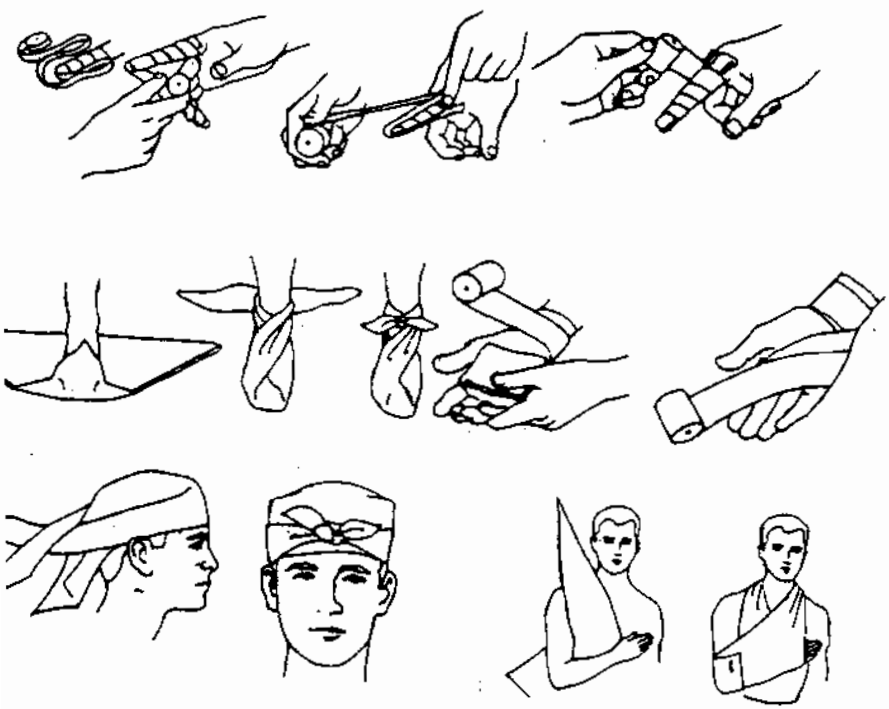

www.banglainternet.com

নবম অধ্যায়

হাড় ভেঙ্গে গেলে

সাধারণ আঘাত প্রাপ্তির ফলে অস্থি ভঙ্গ হয়। সম্পূর্ণ কিংবা অসম্পূর্ণভাবে হাড়ের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হওয়াই হলো হাড় ভাঙ্গা বা অস্থি ভঙ্গ।

হাড় ভাঙ্গার কারণ সমূহ

১। বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা যেমন সড়ক দুর্ঘটনা, রেল দুর্ঘটনা ইত্যাদি।
২। কোনও স্থান থেকে পড়ে গেলে।
৩। হাঁট চলার সময় অসতর্ক মুহূর্তে পড়ে গেলে।
৪। খেলাধূলার সময়।
৫। কোনও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে।
৬। ইট, পাথর ইত্যাদি ভারী জিনিস শরীরের ওপর এসে পড়লে।

হাড় ভাঙ্গার প্রাথমিক চিকিৎসা

হাড় ভাঙ্গার পূর্ণ চিকিৎসা পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রাথমিক চিকিৎসার অন্তর্ভূক্ত রাখতে হবে। যে কোনও অস্থি ভঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। যে কোনও অস্থি ভঙ্গে বিনা চিকিৎসা এবং কুচিকিৎসায় ফেলে রাখা যাবে না। বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। সঠিক ভাবে চিকিৎসা না হলে অনেক সময় চিকিৎসা ব্যয় বহুল হয়ে পড়ে।

হাড় ভাঙ্গার লক্ষণ সমূহ বুঝবেন কিভাবে

১। তীব্র ব্যথা ও ফোলা।
২। আক্রান্ত অঙ্গের নাড়াচাড়া কষ্টকর হবে।
৩। ত্বকের নিচে কালশিরা দেখা যাবে।
৪। কেউ যদি স্পর্শ করে তবে অত্যন্ত বেদনা হবে। এবং রোগী ঐ অঙ্গ কাউকে স্পর্শ করতে দিতে চাইবে না।
৫। কোনও অঙ্গ যদি ভেঙ্গে যায় তবে সে অঙ্গ অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে থাকে।
৬। চামড়ার নিচে যদি রক্তক্ষরণ হয় তবে কালশিটে দাগ পড়ে।

www.banglainternet.com

হাড় ভেঙ্গে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পদ্ধতি

১। যদি কোনও জায়গার হাড় ভেঙ্গে গেছে বলে মনে হয়, তবে সে জায়গা রগড়ানো বা মালিশ করা উচিত নয়।

২। আহত লোককে অযথা নাড়াচাড়া না করে সাবধানে বসিয়ে কিংবা শুইয়ে দিতে হবে।

৩। বরফ কিংবা ঠাণ্ডা পানির পট্টি দিলে ব্যথা ও ফোলা কমে যাবে।

৪। রোগী যদি ব্যথায় কষ্ট পায়, তবে বেদনানাশক ওষুধ দিতে হবে।

৫। এমন কোনও জিনিস ভাঙ্গা স্থানে লাগাবেন না যা ত্বকের ক্ষতি করতে পারে এবং পরবর্তীতে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে।

৬। ভাঙ্গা হাড় যতটুকু সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যায় ততটুকুই আনতে হবে, কারণ পুনঃস্থাপন করা প্রাথমিক চিকিৎসকের দায়িত্ব নয়।

৭। রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে।

বিভিন্ন ধরনের হাড় ভাঙ্গার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থা

১। যদি উরুর হাড় ভাঙ্গে তবে সমস্তটা শরীর তক্তা দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে এবং অতি দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

২। যদি পাঁজরের হাড় ভেঙ্গে যায় তবে এটি বিশ্রাম নিলেই সেরে যায় অযথা না বাঁধাই ভাল। তবে সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

৩। হাড় ভেঙ্গে যদি চামড়া কেটে বেরিয়ে আসে তবে ঐ হাড় ফোটানো পানিতে পরিষ্কার করে ধুয়ে হাড়ের ক্ষতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এবং সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

৪। যদি ঘাড় ও পিঠের হাড় ভেঙ্গে থাকে তবে পিঠ ও ঘাড় না বেঁকিয়ে আহত লোককে সরাতে হবে এবং নড়াবার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

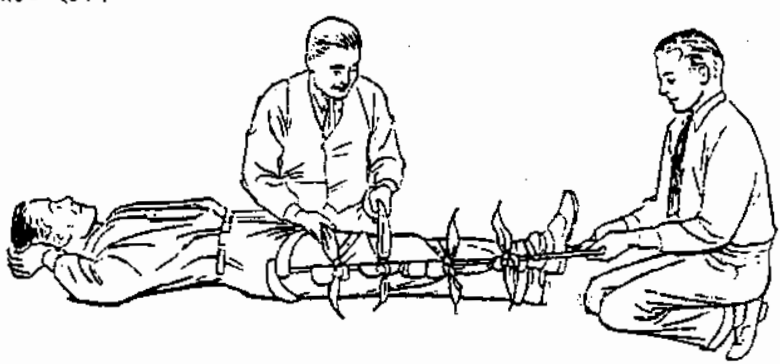

www.banglainternet.com

হাড় মচকে গেলে প্রাথমিক অবস্থায় করণীয় কাজ

১। প্রথমেই মচকানো আর ফোলা কমানোর জন্য মচকে যাওয়া অঙ্গ উপরে তুলে রাখতে হবে।

২। মচকানো অঙ্গ বরফ পানিতে চুবাতে হবে।

৩। ২৪ ঘণ্টা পর গরম পানিতে চুবাতে হবে।

৪। মচকে যাওয়া অঙ্গ ভেঙ্গে যাওয়া অঙ্গের মতোই বেশি নাড়াচাড়া করা যাবে না। আক্রান্ত অঙ্গটি যাতে শক্তভাবে ধরে রাখা যায় এজন্য কিছু দিয়ে বাঁধতে হবে।

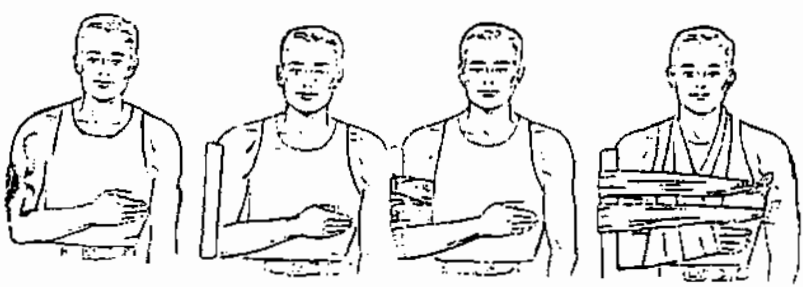

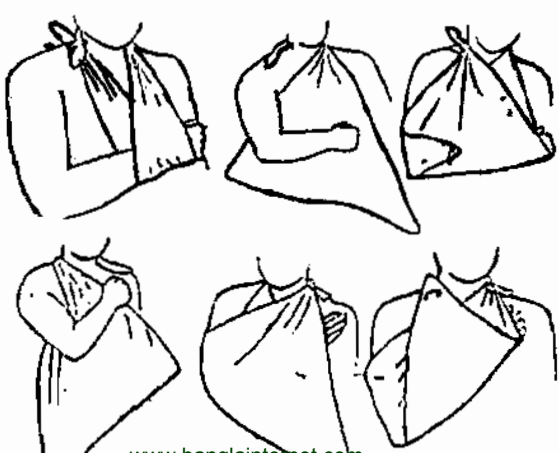

www.banglainternet.com

দশম অধ্যায়

বিভিন্ন তাপদাহের আঘাত

সূর্যালোক কিংবা প্রচণ্ড রোদে দেহে তাপদাহের ফলে যে আঘাতের সৃষ্টি হয় তাকে সান স্ট্রোক বা হিট স্ট্রোক বলে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলোতে যখন খুব বেশি গরম পড়ে তখন মানুষজন ঘামতে থাকে তার ফলে কিছু লবণ জাতীয় পদার্থ দেহ থেকে বের হয়ে যায়। আমরা আমাদের খাদ্যের মাধ্যমে এ লবণের অভাব পূরণ করে থাকি। এজন্য গরম যখন খুব বেশি পড়ে তখন আমরা নোনতা জিনিস খেতে পছন্দ করি। আমাদের শরীরের উত্তাপ যদি বেশি হয় তবে ঘাম সৃষ্টি হয়ে দেহ শীতল হয়। সাধারণত যে সকল স্থানে রৌদ্রের তাপ তীব্র, বায়ু কম এবং আদ্র গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় অঞ্চলে রৌদ্রদাহের ঘটনা বেশি ঘটে থাকে। সাধারণত কর্মরত শ্রমিক এবং ক্রিড়াবিদরা এ অবস্থার শিকার হতে পারে।

তাপদাহের লক্ষণ বোঝার উপায়

তাপদাহ খুব বেশি হয় না কিন্তু হলে খুব বিপজ্জনক। গরমকালে, বিশেষ করে বেশি বয়সের লোকদের মধ্যে এটি হয়ে থাকে।

১। গা লাল, খুব গরম আর শুকনো হয়ে যায়। দেখা যায় যে, রোগীর বগলও ঘামে ভেজে না।

২। রোগীর দেহের তাপমাত্রা ১০৪° ফারেনহাইটের ওপরে উঠে যায়।

৩। রোগীর শরীরের তাপমাত্রা খুব বেড়ে যায় এবং সেই সাথে রক্ত সঞ্চালনও বেশি হয়।

৪। রোগীর নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত হয়।

৫। রোগী অত্যধিক অস্থিরতা বোধ করে এবং সেই সাথে অস্বস্তিও অনুভব করে।

৬। রোগীর মাথা ব্যথা করে ও মাথা ঘোরে।

৭। রোগী প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে যায় এবং মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়।

www.banglainternet.com

প্রাথমিক চিকিৎসা

১। শরীরের তাপমাত্রা কমাতে হবে।

২। রোগীকে শীতল ছায়ায় রাখতে হবে। সেই সাথে ঘাড় ৫/৭ ইঞ্চি উঁচুতে রেখে শুইয়ে দিতে হবে।

৩। গায়ের সমস্ত জামাকাপড় খুলে ফেলতে হবে।

৪। রোগীর গায়ে পানি ঢালতে হবে কিংবা ঠাণ্ডা পানি দিয়ে রোগীর গা মুছে দিতে হবে।

৫। রোগীকে বাতাস করতে হবে। কিংবা ফ্যানের নিচে রাখতে হবে।

৬। প্রচুর লবণ-পানি পান করাতে হবে।

৭। ১০ মিনিট পর পর গায়ের তাপমাত্রা নিতে হবে এবং ১০৩° ফারেনহাইট পর্যন্ত তাপমাত্রা না নামলে শরীর বার বার মুছতে হবে।

৮। বরফের টুকরো পাওয়া গেলে রোগীর ঘাড় ও পিঠের ওপর ঘষতে হবে।

৯। বরফ পানির ডুস দিতে হবে।

১১। অতি শীঘ্র ডাক্তারি সাহায্য নিতে হবে।

গরমে খিল ধরা

গরমে যে সব লোক বেশি পরিশ্রম করে কিংবা প্রচুর ঘামে এদের হাতে, পায়ে কিংবা পেটে খিল ধরতে পারে। শরীরে সাধারণত লবণের অভাব দেখা দিলে এসব হয়ে থাকে।

চিকিৎসা পদ্ধতি

১ লিটার ফোটানো পানিতে এক চা চামচ লবণ গুলে রোগীকে খেতে দিতে হবে। পানিতে একটু চিনি এবং লেবুর রসও মিশিয়ে নেওয়া যায়।

তাপদাহ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা

১। অতিরিক্ত উত্তাপের মধ্যে বেশি সময় ধরে ঘোরাফেরা করা উচিত নয়। অতিরিক্ত উত্তপ্ত কোনও স্থান যেমন– অতিরিক্ত ভীড়, উত্তপ্ত কলকারখানা, খেলার মাঠ ইত্যাদি স্থানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয়।

২। শরীর যদি খুব বেশি অবসন্ন থাকে কিংবা দুর্বল থাকে তবে ভ্রমণ করা কিংবা কাজ করা উচিত নয়।

www.banglainternet.com

৩। পায়খানা যদি পরিষ্কার না হয় তবে পেটে বায়ু সৃষ্টি হয়ে শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে এজন্য পায়খানা পরিষ্কার রাখা কর্তব্য।

৪। প্রতিদিন সকাল বিকাল উদ্যানে ভ্রমণ করা স্বাস্থের জন্য ভাল।

৫। প্রতিদিন কিছু কাঁচা ফলমূল এবং সেদ্ধ সব্জি খাওয়া ভাল।

৬। চা, কফি, ব্র্যাণ্ডি ইত্যাদি উত্তেজক পানীয় পরিহার করতে হবে।

৭। যখন খুব বেশি গরম পড়বে তখন কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে স্যালাইনের পানি পান করতে হবে।

৮। কিছু টক জাতীয় ফল লবণ দিয়ে খেতে হবে।

৯। গ্রীষ্মকালে প্রচুর পানি পান করতে হবে।

www.banglainternet.com

Goto List >

একাদশ অধ্যায়

চোখের আঘাত সম্পর্কে কিছু কথা

মানুষের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চোখ এক অমূল্য সম্পদ। বিভিন্ন কারণে চোখের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। চোখে যদি ধুলিকণা কিংবা ছোট পোকামাকড় উড়ে এসে পড়ে। কোনও রাসায়নিক দ্রব্য চোখে পড়লেও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

চোখে যদি কিছু পড়ে তবে লক্ষণ বুঝবেন কি করে

১। রোগীর চোখে অস্বস্তি বোধ হবে।

২। রোগী চোখ রগড়াতে থাকবে।

৩। চোখে জ্বালা যন্ত্রণা হবে।

৪। চোখ লালচে হয়ে যাবে।

৫। চোখ দিয়ে পানি পড়বে।

৬। চোখ মেলে দেখতে গেলেই কষ্ট পাবে।

৭। মাথা ব্যথা হতে পারে।

কিভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করবেন

১। চোখ কচলানো বন্ধ করতে হবে।

২। রোগীকে আলোর দিকে মুখ করে বসাতে হবে এবং চোখ বরাবর আলো ফেলতে হবে।

৩। চোখের ওপরে ও নিচের পাতা আলাদাভাবে মেলে ধরে চোখের ভেতরে কোনও কিছু পড়ছে কি-না তা দেখতে হবে।

৪। কোনও বস্তু চোখের ভিতরে পড়লে চোখের কোণার ভাঁজের কিনারায় খোঁজ করলে তা পাওয়া যাবে।

৫। যদি কোনও বস্তু পড়ে থাকতে দেখা যায় তবে একটি নরম কাপড় বা রুমাল ভিজিয়ে ওটা সরিয়ে ফেলতে হবে।

www.banglainternet.com

৬। যদি বস্তুটি চোখের উপরের পাতায় আটকে থাকে, তবে নিচের পাতার ওপর দিয়ে উপরের পাতাকে উঠানামা করতে হবে তবেই জিনিসটি বের হয়ে যাবে।

৭। প্রচুর পরিমাণে পানি দিয়ে চোখ ধুতে হবে। অথবা এক গামলা পানি নিয়ে তাতে চোখ ডুবিয়ে বার বার চোখ খুলে ও বন্ধ করে চোখ ধুতে হবে।

৮। অনেক সময় চোখের পাতায় হালকা ক্ষত হলেও চোখে কিছু পড়েছে বলে মনে হয়।

৯। চোখে পড়া বস্তুটি যদি শক্তভাবে আটকে থাকে তবে হালকা ব্যাণ্ডেজ করে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে।

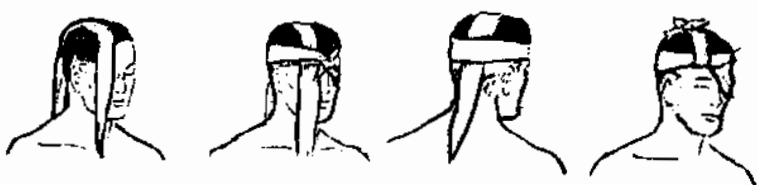

সব সময় চোখকে নিরাপদে রাখবেন কিভাবে

১। সব সময় চোখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

২। দিনের মধ্যে কয়েকবার চোখ ধোয়া ভাল। রাতে শোবার সময় চোখ ধুলে সারাদিনের ধুলো ময়লা চলে যায়।

৩। চোখ মোছার জন্য সব সময় পরিষ্কার গামছা, রুমাল ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত।

৪। এক চোখে যদি আগেই সংক্রমণ হয়ে থাকে, তবে অন্য চোখে আলাদা কাপড় ব্যবহার করলে সংক্রমণ ছড়াতে পারে না।

৫। কাজল ব্যবহার করলে প্রত্যেকের জন্য আলাদা কাঠি রাখা ভাল।

www.banglainternet.com

৬। চোখ যদি কোনও ভাবে সংক্রমিত হয়ে থাকে তবে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনও ওষুধ লাগালে কাজ নাও হতে পারে, এমনকি অন্ধও হয়ে যেতে পারে।

৭। চোখ ভাল রাখার জন্য সব সময় তাজা শাক সব্জি এবং ফলমূল খাওয়া ভাল। সবুজ শাক সব্জি ও হলুদ ফলমূলে ভিটামিন 'এ' থাকে। এগুলো খেলে রাতকানা রোগ এড়ানো যায়।

চোখের কতগুলো সাধারণ সমস্যা ও তার ঘরোয়া প্রতিকার

চোখ ওঠা

চোখ সংক্রমণ হলে চোখ প্রচণ্ড লাল হয়। ঘুম থেকে ওঠার পর চোখের পাতা জুড়ে থাকে। চোখ দিয়ে পানি পড়ে ও সেই সাথে চোখে পুঁজ জমে। চোখ জ্বালা করে।

করণীয়

প্রথমেই এক গ্লাস পানিতে এক চিমটে লবণ দিয়ে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা হতে দিন। কয়েক টুকরো পরিষ্কার কাপড় বা তুলোর টুকরো একটি আলাদা পাত্রে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে ঠাণ্ডা করে নিতে হবে।

পরিচর্যাকারীর হাত দুটি প্রথমে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। প্রথমে যে চোখ সুস্থ সেই চোখকে মাটি বরাবর কাত হয়ে শুতে বলতে হবে। ফোটানো পানি সুস্থ চোখটির নাকের দিকের কোণে ধীরে ধীরে ঢালতে হবে। চোখের তলায় একটি পাত্র রেখে ময়লা পানিটা ধরতে হবে। এরপর রোগীকে চোখ বন্ধ করতে বলতে হবে। ফোটানো কাপড়ের টুকরো থেকে এক টুকরো কাপড় দিয়ে নাকের দিক থেকে শুরু করে কানের দিকে চোখটা মুছে দিতে হবে। পরে সেই কাপড়ের টুকরো ও ময়লা পানি ফেলে দিতে হবে। এক চোখের কাপড় অন্য চোখে ব্যবহার করা যাবে না।

www.banglainternet.com

এরপর অসুস্থ চোখটি মুছতে হবে। অসুস্থ চোখটি মুছতে হলে চোখটি মাটির কাছে রাখতে হবে। প্রথমেই ফোটানো লবণের পানি দিয়ে চোখটা ভিজিয়ে নিতে হবে। চোখের পাতা দুটো জুড়ে গেলে জোরপূর্বক না খুলে আস্তে করে খুলে দিতে হবে। এবার সুস্থ চোখটির মতো করেই অসুস্থ চোখটিও মুছে দিতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ মতো চোখে ওষুধ দিয়ে দিতে হবে। যতক্ষণ চোখটি স্বাভাবিক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত চোখে ওষুধ দিয়ে যেতে হবে। এছাড়া কিছুক্ষণ পর পর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে চোখ ধুলে চোখের ভাইরাস ধুয়ে যাবে।

চোখ ওঠা না ছড়ানোর উপায়

১। চোখ উঠলে পরে ঠিকমত চোখের যত্ন নিতে হবে।

২। চোখে হাত দেবার পর হাত ধুতে হবে।

৩। রোগীর রুমাল কিংবা গামছা যাতে অন্য লোকে ব্যবহার না করে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৪। ছেলেমেয়েদেরকে একজনকে অন্যজনের সাথে খেলতে কিংবা শুতে দেওয়া যাবে না।

৫। যতদূর সম্ভব ভীড় এড়িয়ে চলতে হবে।

৬। রঙিন চশমা ব্যবহার করতে হবে।

চোখে অঞ্জনি ওঠা

অঞ্জনি চোখের পাতার ওপরে হয়। চোখের কিনারার কাছে লাল হয়ে ফোড়ার মতো ফুলে থাকে। গরম পানিতে একটু লবণ দিয়ে সেঁক দিলে অঞ্জনি কমে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এন্টিবায়োটিক মলম লাগাতে হবে।

www.banglainternet.com

দৃষ্টি শক্তির অক্ষমতা

ছেলেমেয়েদের যদি পরিষ্কার দেখায় অসুবিধার সৃষ্টি হয় কিংবা পড়তে বসলে মাথাব্যথা করে তবে ডাক্তার দেখাতে হবে।

মানুষের যত বয়স বাড়বে ততই স্বাভাবিক ভাবেই কাছের জিনিস দেখতে কষ্ট হয় এজন্য পড়ার সময় চশমা পরলে সুবিধা হয়। এমতাবস্থায় ডাক্তার দেখিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী চশমা ব্যবহার করতে হবে।

ভিটামিন 'এ'-র অভাবজনিত রোগ

সাধারণত ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ভিটামিন 'এ'-র অভাবজনিত রোগ দেখা যায়। ভিটামিন 'এ'-র অভাবে রাতকানা রোগ হয়ে শিশু অন্ধও হয়ে যেতে পারে।

ভিটামিন 'এ'-র অভাবজনিত রোগের লক্ষণ

১। ভিটামিন 'এ'-র অভাবে প্রথমে রাতকানা রোগ হয়ে থাকে। রাতকানা রোগে রোগী অন্ধকারে কম দেখতে পায়।

২। চোখের সাদা অংশের চকচকে ভাব চলে যায় এবং চোখ কুঁচকে যায় সেই সাথে চোখ শুকিয়ে যায়।

৩। চোখে ছোট ছোট ছাইরঙের দাগ পড়ে।

৪। রোগ বেড়ে গেলে কর্নিয়া ঘোলাটে ভাব ধারণ করে ছোট ছোট গর্ত হয়ে যায়।

৫। কর্নিয়া নরম হয়ে যায় এবং মনে হয় ঠেলে বেরিয়ে আসছে। এ অবস্থায় কর্নিয়া ফেটেও যেতে পারে। কিন্তু এতে কোনও যন্ত্রণা থাকবে না। এসব ক্ষতচিহ্ন থেকে ছেলেমেয়েরা ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যায়।

৬। ডায়রিয়া, কাশি, যক্ষা ইত্যাদি রোগ হওয়ার পর ছেলেমেয়েদের চোখ পরীক্ষা করানো উচিত।

ভিটামিন 'এ' পেতে হলে কি করবেন

১। দু'বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াবেন।

২। হলুদ ও লাল রঙের ফল ও তরিতরকারীতে ভিটামিন 'এ' প্রচুর পরিমাণে থাকে।

৩। দুধ, ডিম ইত্যাদিতেও ভিটামিন 'এ' আছে।

৪। শিশুদের প্রতি ৬ মাস অন্তর একবার ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে।

www.banglainternet.com

ট্র্যাকোমা

ট্র্যাকোমা একটি পুরনো চোখের রোগ। এই রোগ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে হয়ে থাকে। এই রোগ ছোঁয়াচে এবং মাছির মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে। যেসব স্থানে অনেক লোক গাদাগাদি করে বাস করে সেসব স্থানে এ রোগ বেশি দেখা যায়। চিকিৎসা না করালে এসব রোগ সারে না। এগুলো কয়েক মাস যাবৎ এমন কি কয়েক বছর যাবৎ চলতে পারে। এসব রোগে লোক অন্ধ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।

ট্র্যাকোমার লক্ষণ বুঝবেন কি করে

১। সাধারণ চোখ ওঠার মতোই মনে হয়।

২। চোখ দিয়ে পানি পড়ে এবং চোখ সর্বক্ষণ লাল হয়ে থাকে।

৩। চোখের সাদা অংশে জ্বালা যন্ত্রণা থাকে।

৪। কর্নিয়ার ওপরের কিনারায় ছোট ছোট রক্তনালী হওয়ার কারণে ওপরের কিনারাটা ছাই ছাই রঙের দেখায়।

৫। এই রোগ যখন এক মাস হয়ে যায় তখন ওপরের পাতার নিচে ছোট ছোট গোলাপী এবং ছাই রঙের গুটির মতো দেখা যায়।

৬। কয়েক বছর পর এই ক্ষতগুলো যখন ভাল হয়ে যায় তখন দাগগুলো থেকে যায় এবং এই দাগগুলোর জন্যই চোখ পুরোপুরি বন্ধ করতে অসুবিধা হয়।

৭। এগুলোর জন্যই চোখের পাতার চুলগুলো কর্নিয়ার ওপর আঁচড় দিয়ে অন্ধত্ব ঘটাতে পারে।

কিভাবে ট্র্যাকোমা এড়াবেন

১। চোখের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে।

২। ট্র্যাকোমা রোগীর সাথে যারা থাকবেন এদেরও ঘন ঘন চোখ পরীক্ষা করতে হবে।

৩। যথাসময়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে।

চোখ দিয়ে পানি পড়া

চোখের পানির থলিতে সংক্রমণ ঘটলে চোখ দিয়ে প্রচুর পানি পড়ে। চোখের নিচ বরাবর নাকের ঠিক পাশে ফুলে থাকে। ফোলার ওপর আস্তে করে চাপ দিলে পুঁজ বের হয়।

www.banglainternet.com

চিকিৎসা পদ্ধতি

১। চোখে গরম সেঁক দিতে হবে।

২। ডাক্তারের পরামর্শমত এন্টিবায়োটিক ড্রপ বা মলম লাগাতে হবে।

৩। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী পেনিসিলিন খেতে হবে।

চোখের সাদা অংশ লাল হয়ে যাওয়া

হঠাৎ করে চোখে কোনও ধাক্কা লাগলে, জোরে কাশলে কিংবা ভারী জিনিস তুললে চোখ রক্তের মতো লাল হয়ে থাকে। এতে কোনও রূপ ব্যথা বেদনা হয় না এবং ক্ষতিও হয় না। চোখের ছোটখাটো রক্তনালী ফেটে গেলে এরকম হয় এজন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। ধীরে ধীরে এটা ভাল হয়ে যায়।

কর্নিয়ার আলসার

কর্নিয়া সংক্রমণ হলে কর্নিয়ার ওপরের নরম পর্দা ছিঁড়ে গিয়ে আলসার হতে পারে। কর্নিয়ার ওপর তখন ছাই ছাই রঙের কম চকচকে জায়গা দেখতে পাওয়া যায়।

কর্নিয়ার আলসার থেকে লোকে অন্ধ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। এজন্য অতি সত্বর ডাক্তার দেখাতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চোখে এন্টিবায়োটিক মলম লাগিয়ে ওষুধ খেতে হবে।

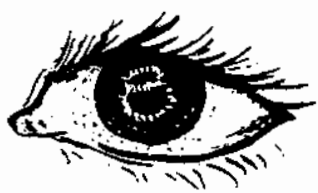

টেরিজিয়াম

রোদ, বাতাস ও ধুলো থেকে চোখে টেরিজিয়াম হয়ে থাকে। চোখের ওপরে পুরু হয়ে যাওয়া মাংস চোখের কোণ থেকে আরম্ভ করে কর্নিয়ার ওপরে চলে যায়।

www.banglainternet.com

চোখের মণিতে প্রবেশ করার পূর্বেই অপারেশন করা প্রয়োজন। রাস্তায় বের হলে রঙিন চশমা পরলে টেরিজিয়ামটা অতটা বাড়ে না।

www.banglainternet.com

Goto List >

দ্বাদশ অধ্যায়

দাঁত, মাড়ি ও মুখের কিছু সমস্যা

কথায় বলে 'দাঁতের সাথে আঁতের সম্পর্ক।' দাঁত আমাদের মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সুন্দর দাঁত আমাদের হাসির সৌন্দর্য বর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সর্বোপরি খাবার ভালভাবে চিবিয়ে হজম করার জন্য মজবুত ও সুস্থ দাঁতের প্রয়োজন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে দাঁত ক্ষয়ে যায়। ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত থেকে যে মারাত্মক সংক্রমণ হয়ে থাকে তা শরীরের অপর অংশেরও ক্ষতিসাধন করে থাকে। তবে মুখ ও দাঁতের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে শুধু পরিষ্কারের বিষয়টিই যথেষ্ট নয়, বরং সঠিক এবং নিয়মিত পরিচর্যার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। অনেকে অভিযোগ করে থাকেন যে, 'নিয়মিত দাঁত মেজে থাকি, তারপরও দাঁতের সমস্যার কোনও অন্ত নেই।' এরা দাঁত পরিষ্কার করেন ঠিকই কিন্তু এদের পদ্ধতিগত কিংবা ব্যবহারগত ত্রুটি থেকে যায়। যেমন– কেউ ব্রাশ ব্যবহার করে থাকেন কেউ মেসওয়াক আবার কেউবা আঙ্গুল দ্বারা দাঁত মেজে থাকেন। মাজন ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কেউ ব্রাশের সাথে পেস্ট, কেউ পাউডার আবার আর্থ সামাজিক অবস্থানে যারা নিম্ন শ্রেণীর তারা ছাই, মাটি, কয়লা ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন। এ ধরনের মাজন ব্যবহার করা বিজ্ঞানসম্মত নয়। কারণ, এগুলো ব্যবহারে দাঁত পরিষ্কার হয় ঠিকই কিন্তু দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে হিতে বিপরীত হয়ে থাকে। এতে দাঁতের এনামেল ক্ষয় হয়ে দাঁত সিন্ সিন্ করতে থাকে। দাঁতের গোড়ার মাংসপেশী সরে গিয়ে দাঁত দুর্বল হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা গরম খেলে দাঁত সিন্ সিন্ করা, দাঁত ব্যথা ইত্যাদি হয়ে থাকে। তাই দাঁত সুরক্ষার জন্য বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সঠিক উপায়ে দাঁতের পরিচর্যা করতে হবে। আর এজন্য সঠিক উপায়ে পরিচর্যা ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সচেতনতার দিকে নজর দেওয়া উচিত। আমাদের দেশে একটি প্রচলিত নিয়ম আছে যে, ঘুম থেকে উঠে দাঁত পরিষ্কার করা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ঠিক নয়, বরং সকালে নাস্তার পর এবং রাতে ঘুমের পূর্বে দাঁত পরিষ্কার করা উচিত। কারণ অপরিষ্কার মুখ নিয়ে ঘুমোলে মুখের মধ্যস্থিত ব্যাকটেরিয়া

www.banglainternet.com

রোগ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এছাড়া ঘুমের মধ্যে লালা নিঃসরণের পরিমাণ কমে যায় বলে মুখ ও দাঁতের রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। তাই ঘুমোতে যাবার পূর্বে দাঁত মাজার অভ্যেস করা উচিত।

কিভাবে দাঁত ব্রাশ করবেন

১। প্রথমে ব্রাশটিকে আড়াআড়ি ভাবে ধরতে হবে যেন ব্রাশের ব্রিসেলস্‌গুলো দাঁতের গোড়ায় দাঁত বরাবর লম্বাভাবে থাকে।

২। ওপরের দাঁত ওপর থেকে নিচে এবং নিচের দাঁত নিচ থেকে ওপরের দিকে মাজতে হবে।

৩। এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দাঁতের ভেতরের দিক এবং বাইরের দিক ব্রাশ করতে হবে, যেন ব্রাশের ব্রিসেলস্‌গুলো দুই দাঁতের মধ্যবর্তী স্থানে জমে থাকা খাদ্যকনা দূর করতে পারে।

৪। দাঁতের একপাশ থেকে অন্যপাশে মাজা যাবে না।

৫। ওপরের চোয়ালের ডান দিকের ভেতরের পিঠ থেকে দাঁত ব্রাশ শুরু করতে হবে।

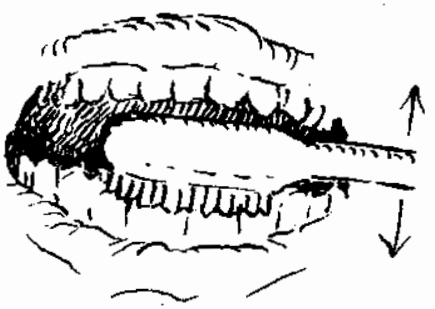

কতক্ষণ সময় ব্রাশ করবেন

দাঁত ব্রাশ নিয়ে জনমনে বিভিন্ন ধারণা আছে। অনেকে মনে করেন বেশি সময় ধরে ব্রাশ করলে দাঁতের জন্য ভাল। আসলে দাঁত ব্রাশের বিজ্ঞানসম্মত সময় হলো ২ থেকে ৩ মিনিট।

www.banglainternet.com

দিনে কতবার ব্রাশ করবেন

বিজ্ঞানসম্মত ভাবে দিনে দুইবার ব্রাশ করা উচিত। রাতে ঘুমানোর পূর্বে এবং সকালে নাস্তার পরে।

কি দিয়ে ব্রাশ করবেন

দাঁত মাজা অবশ্যই ব্রাশ ও পেস্ট দিয়ে করা উচিত। ব্রাশের পরিবর্তে মেসওয়াক ব্যবহারও বিজ্ঞানসম্মত। নিমের ডাল, জয়তুনের ডাল ইত্যাদি আঁশযুক্ত ডাল দিয়ে মেসওয়াক করা ভাল। এসব ডাল 'ডেন্টাল ক্যারেজ' প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। কারণ এগুলো থেকে ফ্লোরাইডের একটি প্রাকৃতিক উৎস পাওয়া যায়।

দাঁতের কিছু সাধারণ রোগ ও তার নিরাময়ের ব্যবস্থা

পায়োরিয়া

পায়োরিয়া হলে মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে এবং মাড়িতে যন্ত্রণা হয়। মাড়ি লাল হয়ে ফুলে ওঠে। দাঁত ও মাড়ি ঠিকমত পরিষ্কার না করলে এবং যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার না খেলে পায়োরিয়া রোগ হয়।

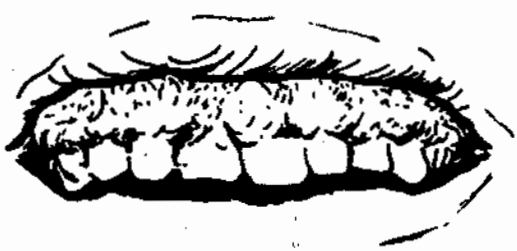

পায়োরিয়া এড়ানোর উপায়

১। প্রতিবার খাওয়ার পর দাঁত ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে।

২। দাঁতের ফাঁকে যে খাদ্যকনা জমে থাকে তা পরিষ্কার রাখতে হবে।

৩। দাঁত এবং মাড়ির মাঝখানে হলদে রঙের যে পর্দা পড়ে সেগুলো পরিষ্কার করে কুসুম গরম লবণ-পানি দিয়ে কুলকুচা করতে হবে।

৪। মিষ্টি ও আঠালো খাবার পরিত্যাগ করতে হবে।

www.banglainternet.com

৫। দাঁতের ফাঁকে আঁটকে যায় এ ধরনের আঁশযুক্ত খাবার পরিত্যাগ করতে হবে।

৬। ভিটামিনে ভরা খাবার যেমন– দুধ, ডিম বিভিন্ন ফলমূল এবং ঘন রঙের শাক সব্জি খেতে হবে।

জীবনভর দাঁত সুরক্ষার জন্য কতিপয় উপদেশ

১। নিয়মিত ও সঠিক উপায়ে দাঁত ব্রাশ করতে হবে।

২। দাঁত মাজার পর নিয়মিত মাড়ি ম্যাসেজ করতে হবে।

৩। প্রধান খাবারের মধ্যবর্তী সময়টুকু মিষ্টি জাতীয় খাবার পরিহার করতে হবে।

৪। বছরে এক থেকে দু'বার মুখ ও দাঁত পরীক্ষা করতে হবে।

৫। দাঁতে কোনও গর্ত থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ নিবেন।

৬। শিশুদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় ফিডার না দেওয়াই ভাল।

মুখের একটি বিব্রতকর সমস্যা

ফুলের মনোমুগ্ধকর সুবাস মানুষকে মোহিত করে। তাই মানুষ মাত্রই আবিষ্ট হয়ে ফুলের প্রতি আকর্ষিত হয়। পক্ষান্তরে মানুষ যদি ময়লার ডাস্টবিন কিংবা ট্যানারীর পাশ দিয়ে যায় তবে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে থাকে। এমন দুর্গন্ধ যদি মানুষের মুখ থেকে বের হয় তবে কেমন বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হবে একবার ভেবে দেখুন তো? যার মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয় সে তা টের পায় না। টের পায় তারাই যারা তার কাছাকাছি থাকে। মুখে দুর্গন্ধ কারও জন্যই সুখকর নয়। মুখে দুর্গন্ধ হওয়ার নানাবিধ কারণ আছে। যথাসময়ে মুখ ও দাঁত পরিষ্কার না করার কারণে খাদ্যকনা পঁচে গিয়ে মুখে দুর্গন্ধ হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে কিছু রোগের কারণেও মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে।

চিকিৎসা

মুখে দুর্গন্ধ কেন হয় সর্বপ্রথমে এর কারণ নির্ণয় করতে হয়। আর সেজন্য রোগের ইতিহাস জানতে হবে এবং মুখ ও দাঁত পরীক্ষা করতে হবে। শারীরিক কারণেও মুখে দুর্গন্ধ হয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মুখের মধ্যস্থিত কারণই এর জন্য দায়ী, সুতরাং এ ব্যাপারে মুখ ও দন্তরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। ভুক্তভোগীগণ নিম্নলিখিত পরামর্শ নিতে পারেন। যেমন–

www.banglainternet.com

১। সকালের নাস্তার পর এবং রাতে ঘুমোতে যাবার পূর্বে নিয়মিত দু'বেলা দাঁত মাজতে হবে।

২। দাঁতের মাড়ি, জিহ্বা কিংবা গলায় কোনও ক্ষত থাকলে তা অতিসত্বর চিকিৎসা করাতে হবে।

৩। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী মাউথ ওয়াশ দিয়ে কুলি করতে হবে।

৪। ধুমপান করা ও মদ্যপান করা বর্জন করতে হবে।

৫। পাথর, প্ল্যাক দাঁতের গোড়ায় জমলে তা পরিষ্কার করতে হবে।

৬। দীর্ঘদিন যাবৎ যদি কাশি, গলাব্যথা ও বুক ব্যথা হয় তবে তার চিকিৎসা করতে হবে।

৭। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

৮। রোগাক্রান্ত দাঁতের চিকিৎসা করতে হবে।

৯। ভাঙ্গা দাঁত থাকলে তা তুলে ফেলতে হবে।

১০। মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে।

১১। মাঝে মাঝে টক জাতীয় লজেন্স খাওয়া উচিত যাতে মুখের লালা নিঃসরণ ঠিক থাকে।

ঠোঁটের কোণে ঘা

ছেলেমেয়ের ঠোঁটের কোণে ঘা সাধারণত অপুষ্টির লক্ষণ বোঝায়। তাই ঘা হলে ছেলেমেয়েদের ভিটামিন এবং প্রোটিন যুক্ত খাবার যেমন– দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, ফল ও শাক সব্জি খেতে দিতে হবে।

মুখের থ্রাশ

মুখের ভেতরে জিভের ওপরে দইয়ের মতো সাদা সাদা টুকরো প্রলেপ দেখা যায়। এটি ছত্রাক সংক্রমণের জন্য হয়ে থাকে। ছোট শিশুদের মধ্যে এবং কিছু এন্টিবায়োটিক বেশি পরিমাণে সেবন করার ফলে এরূপ হয়ে থাকে। এন্টবায়োটিক খাওয়া খুব জরুরী না হলে তা বন্ধ করে দিতে হবে। সাংঘাতিক অবস্থা হলে নিস্ট্যাটিন ব্যবহার করতে হবে।

জিহ্বার ওপরে সাদা পর্দা পড়া

সাধারণত জ্বর হওয়ার পরে জিহ্বা ও টাকরার ওপরে সাদা পর্দা পড়ে। এটি গুরুতর কোনও কিছু নয়। অল্প গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে কুলকুচা করলে ভাল হয়ে যায়।

www.banglainternet.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চামড়ার বিভিন্ন সমস্যা ও তার কিছু সমাধান

চুলকানি যখন সমস্যা

অধিক জনসংখ্যা, দারিদ্রতা ও অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার কারণে আমাদের দেশে এই চর্মরোগটি বেশি হয়ে থাকে। সাধারণ ভাষায় স্ক্যাবিসকে খুজলী পাঁচড়াও বলা হয়ে থাকে। এ রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে। এ রোগে আক্রান্ত রোগীর সাধারণ সংস্পর্শে, কাপড় চোপড় ও ব্যবহার্য জিনিসপত্রের মাধ্যমেও এ রোগ একজন থেকে অন্যজনের দেহে ছড়িয়ে পড়ে, চুলকানিই হচ্ছে এ রোগের প্রধান উপসর্গ। পরিবারের মধ্যে একজন যদি এ রোগের জীবাণু বহন করে থাকে তবে অন্যান্যদেরও এ রোগ হয়ে থাকে। দিনের চেয়ে রাতেই এ রোগ বেশি বেড়ে যায়, বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ রোগ বেশি দেখা যায়। এ রোগের প্রাক্কালে গুঁড়ি গুঁড়ি লালচে দানা দেখা যায়। চুলকানি বেশি হয়ে গেলে তা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ইনফেক্শন হয়ে যখন পুঁজ দ্বারা ভর্তি হয়ে যায় তখন তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করানো উচিত, নচেৎ এ রোগ থেকে কিডনী আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। চুলকানি শরীরের যে কোনও স্থান হতে আরম্ভ হয়ে ধীরে ধীরে তা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। তবে নির্দিষ্ট কিছু কিছু স্থানে এ রোগ বেশি দেখা যায়। যেমন– আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে, কব্জিতে, কোমরের চারদিকে, কনুইয়ের পেছনে, বগলের ভাঁজে, নাভির চারধারে, পাছাতে, উরুতে, মেয়েদের স্তনে, পুরুষের লিঙ্গে ও অন্ডকোষে, ছোট ছেলেমেয়েদের মুখেও এ রোগ হয়ে থাকে। শরীরের অন্যান্য অংশে এ রোগ হলে ছোট ছোট ঘা দেখা যায়। কিন্তু মুখে কোনও দলা দেখা যায় না। দীর্ঘদিন এ রোগে ভুগলে চুলকোতে চুলকোতে শরীরের ত্বক পুরু বা শক্ত হয়ে অস্বাভাবিক দেখায়।

স্ক্যাবিস হলে সাথে সাথে এর চিকিৎসা করাতে হবে। কারণ সময় মতো যদি চিকিৎসা না হয় তবে ধীরে ধীরে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। নিকট আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কারও যদি এ রোগ থেকে থাকে তবে তাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে এ রোগের চিকিৎসা করাতে হবে। নয়তো তাদের থেকে আরও দশজনের শরীরে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে, এ রোগের চিকিৎসা করতে হলে কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে।

www.banglainternet.com

এ রোগের চিকিৎসার ব্যয়ভার খুব বেশি নয় কিন্তু কিছু নিয়ম কানুন না মানা অথবা না জানার জন্য চিকিৎসা অনেক সময় ব্যর্থ হয়। এ রোগের চিকিৎসা করতে হলে পরিবারের সকলেরই একসাথে চিকিৎসা করা উচিত। কারণ একজনের দেহে জীবাণু থেকে গেলে তা থেকে আবার অন্যদের দেহে প্রবেশ করবে। সব মানুষের দেহে রোগের বিকাশ একই রকম হয় না। তাই কার রোগ আছে কার নেই এটি খুঁজে বের না করে মিলেমিশে ওষুধ ব্যবহার করলে ধুয়ে মুছে জীবাণু ঘর থেকে চলে যায়।

চিকিৎসা

১। কারও চুলকানি হলে বাড়ির সবারই চিকিৎসা করতে হবে।

২। যেহেতু পরিধেয় ও ব্যবহার্য কাপড় চোপড়ের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায় তাই যখন ওষুধ চলবে তখন কাপড় চোপড়, বিছানাপত্র সব পানিতে ফুটিয়ে রোদে শুকোতে হবে। নখের ভেতরে জীবাণু থেকে যায় বলে নখ অবশ্যই ছোট করে কাটতে হবে।

৩। নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা প্রথমেই দরকার। রোজ গোসল করে জামাকাপড় বদলে ফেলতে হবে।

৪। নিয়মিত জামাকাপড় ও বিছানা কেচে রোদে শুকোতে হবে।

৫। চুলকানির চিকিৎসায় খাওয়া দাওয়ায় কিংবা অন্য কিছুতে বাছ বিচার করা যাবে না। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবন যাপন করা যায়। সবশেষে একটি কথা. মনে রাখতে হবে শরীর চুলকালেই স্ক্যাবিস ধরা উচিত নয়। কারণ অধিকাংশ চর্মরোগেই শরীর চুলকায়। তাই সঠিক চিকিৎসার জন্য চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

ফোড়া

সংক্রমণ থেকে চামড়ার নিচে পুঁজের থলি তৈরি হলে তাকে ফোড়া বলে। ফোড়া হলে ব্যথা হয় এবং চামড়া লাল হয়ে গরম হয়ে যায়। ফোড়ার ব্যথা থেকে শরীরে জ্বরও হয়ে থাকে।

ফোড়ার জন্য চিকিৎসা

১। ফোড়া হলে দিনে কয়েকবার গরম পানির সেঁক দিতে হবে।

২। ফোড়া পেকে গেলে নিজ থেকেই ফেটে যায়। অযথা চাপাচাপি কিংবা টেপাটেপি করলে ইনফেশন শরীরের অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

৩। ফোড়া থেকে যদি জ্বর হয় তবে ডাক্তার দেখিয়ে এন্টিবায়োটিক খাওয়াতে হবে।

www.banglainternet.com

দাদ

শরীরের যে কোনও স্থানে এর সংক্রমণ হতে পারে। যেমন– মাথায়, হাতে বা পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে, দু'পায়ের ফাঁকে, লোমহীন জায়গায়।

এই ধরনের ছত্রাকের সংক্রমণ আংটির মতো গোল গোল হয়ে বেড়ে ওঠে। এগুলো প্রায়ই চুলকাতে থাকে। মাথায় যদি হয়ে থাকে তবে খোসা সমেত চুল পড়ে দাগ পড়ে যায়।

কিভাবে দাদের চিকিৎসা করবেন

১। সংক্রমণের জায়গাটুকু প্রতিদিন সাবান পানি দিয়ে ধুতে হবে। প্রয়োজনে ওষুধ যুক্ত সাবান ব্যবহার করবেন।

২। সংক্রমণের জায়গাটা শুকনো বাতাসে কিংবা রোদে খুলে রাখতে হবে। গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া, মোজা ইত্যাদি অন্তর্বাসগুলো সব সময় পরিবর্তন করতে হবে।

৩। মাথায় যদি সংক্রমণ বড় বড় পুঁজ ভর্তি হয় তবে গরম পানির সেঁক দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। সংক্রমণের জায়গাটুকুতে চুলগুলো তুলে ফেলতে হবে।

দাদের সংক্রমণ কিভাবে এড়াবেন

১। যাদের একবার সংক্রমণ হয়েছে তাদের অন্যদের সাথে ঘুমোতে দেওয়া উচিত নয়।

২। ভালভাবে না ধুয়ে একজনের ব্যবহার্য জিনিস অন্যজনকে ব্যবহার করতে দেওয়া যাবে না।

৩। সংক্রমণ হলে সাথে সাথে চিকিৎসা করতে হবে।

এলার্জির চিকিৎসা ও প্রতিকারের উপায়

'এলার্জি' শব্দটি আমাদের দেশে সকলের কাছেই অতি পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও এ নিয়ে বিভ্রান্তির শেষ নেই। অনেকেই ভেবে থাকেন চর্মরোগ মানেই হলো এলার্জি। কিন্তু এলার্জি হচ্ছে অনেকগুলো চর্মরোগের মধ্যে মাত্র একটি চর্মরোগ। এলার্জির লক্ষণগুলো হঠাৎ করে শরীরে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। দেখা যায় শরীরের বিভিন্ন অংশে হঠাৎ করে দানা উঠতে শুরু করে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশের ত্বক লাল ও চাকা হয়ে ফুলে ওঠে এবং সেই সাথে প্রচণ্ড চুলকানি থাকতে পারে। এই চাকগুলো দেখতে মৌমাছির কামড়ের মতো মনে হয়, এলার্জির সাথে শ্বাসকষ্ট, বমি, মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, অস্থিসন্ধির ব্যথা, পাতলা

www.banglainternet.com

পায়খানা ইত্যাদি হতে পারে। অনেক সময় এলার্জির তীব্র রিয়েকশন হলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনও রকম ওষুধ ছাড়াও এলার্জি ভাল হয়ে যেতে পারে। তবে এলার্জি হলে প্রাথমিক অবস্থাতেই সতর্ক হয়ে যেতে হবে। যাদের বংশে হাঁপানি কিংবা একজিমা থাকে তাদের এলার্জি হবার প্রবণতা বেশি। একেক জনের দেহ ত্বকে একেক ধরনের জিনিসের প্রতি এলার্জি হতে পারে। এলার্জির উপযুক্ত চিকিৎসা হচ্ছে এলার্জিক জিনিসটি খুঁজে বের করা। বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য, পরিধেয়, ব্যবহার্য জিনিসপত্র, মশা মাছি ও পোকামাকড়ের কামড়, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, আবহাওয়া, সূর্যালোক এমন কি নির্দিষ্ট কোনও ওষুধের কারণেও এলার্জি হতে পারে। আবার বিভিন্ন আঘাত পেলে, পেটে কৃমি হলে কিংবা দুঃশ্চিন্তা গ্রস্থ হলেও এলার্জি হতে পারে। এলার্জির বিভিন্ন ধরনের ওষুধ আজকাল বাজারে পাওয়া যায় যা খেলে অতি অল্প সময়েই কষ্ট ও চুলকানি থেকে রেহাই মেলে। তবে স্থায়ী চিকিৎসা পেতে হলে এলার্জির কারণ নির্ণয় করতে হবে। মনে রাখা উচিত যে, এলার্জি যে কোনও মানুষের যে কোনও সময়, যে কোনও বয়সে, বছরের যে কোনও সময়েই হতে পারে।

ত্বকের ফাংগাস (ছত্রাক) ইনফেক্শনে করণীয়

ফাংগাস এক ধরনের জীবাণু যা মানুষের শরীরে বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ সৃষ্টি করতে পারে। ছত্রাক জনিত চর্মরোগ শরীরের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এবং একজন থেকে অন্যজনের শরীরে ছড়াতে পারে, কেউ যদি আক্রান্ত রোগীর কাপড়, গামছা, তোয়ালে চিরুনী ইত্যাদি ব্যবহার করে তবুও একজন থেকে অন্যজনে রোগ ছড়াতে পারে। এক এক ধরনের ছত্রাক দেহে এক এক ধরনের চর্মরোগ সৃষ্টি করে। ছত্রাক জনিত চর্মরোগগুলো শীতের দিনের চাইতে গরমের দিনে বেশি প্রভাব বিস্তার করে। ছত্রাক জনিত রোগ মানুষের যে কোনও সময়েই হতে পারে। তবে বিভিন্ন অবস্থায় ছত্রাক জনিত চর্মরোগ বেশি হয়। কিছু কিছু ওষুধ আছে যেমন– টেট্রাসাইক্লিন জাতীয় এন্টিবায়োটিক, জন্মনিয়ন্ত্রনের বড়ি ইত্যাদি খেলে, ডায়াবেটিস থাকলে, গর্ভাবস্থায়, শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকলে, পুষ্টির অভাব হলে, রক্তশূন্যতায়, মোটা ব্যক্তিদের, সিন্থেটিকস কিংবা আঁটোসাটো পোষাক যারা বেশি পরেন তাদের ক্ষেত্রে, যারা দীর্ঘ সময় ধরে পানির সংস্পর্শে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে এ রোগ বেশি হয়। কারণ ছত্রাক গরমে ঘামে ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে বেশি সংক্রমিত হয়।

www.banglainternet.com

ফাংগাস (ছত্রাক) ইনফেকশন এড়াতে হলে

১। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে হবে।
২। ব্যবহার্য কাপড় চোপড় সূতি এবং ঢিলেঢালা হতে হবে।
৩। রোদে গরমে কম যাবেন।
৪। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখবেন।
৫। পুষ্টিহীনতা ও রক্তশূন্যতা থাকলে ঠিক করুন।

সউদ

সউদ এক ধরনের ছত্রাক দ্বারা সংক্রমিত রোগ। গরমের দিনে এই রোগটি বেশি হয়ে থাকে। প্রথমে সাধারণত গলায় ও মুখে শুরু হয়। পরবর্তীতে বুকে, পিঠে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত স্থানগুলোতে ছিটা ছিটা দাগ দেখা যায়। যাদের ফর্সা ত্বক তাদের কালচে দেখায় এবং কালো ত্বক হলে সাদাটে দেখায়। রোদে গেলে সামান্য চুলকানি হয় কিংবা গা চিটচিট করে। এ রোগে তেমন কোনও সমস্যা নেই শুধু দৃষ্টিকটু লাগে।

নানা ধরনের ব্রণ

কথায় বলে 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।' আর এই সুন্দর মুখের জন্য সুস্থ ও সুন্দর ত্বক অপরিহার্য। মুখের ত্বক নিয়ে আমরা সকলেই কম বেশি সচেতন। আমাদের আকর্ষণীয় মুখের সৌন্দর্যকে ম্লান করে দেবার জন্যে ছোট একটি দাগই যথেষ্ট। মুখমণ্ডলে বিভিন্ন ধরনের কালো দাগ পড়তে পারে। তবে এর মধ্যে সৌন্দর্যহানির জন্য সবচাইতে বেশি দায়ী হচ্ছে ব্রণের দাগ। ব্রণ সম্পর্কে নানা জনে নানা ধরনের কথা বলে থাকে। ব্রণ হওয়ার পেছনে মূল কারণ হচ্ছে আমাদের ত্বকের ভেতর থেকে প্রতিনিয়ত এক ধরনের তৈলাক্ত পদার্থ বের হয়। যা লোমকূপের গোড়া দিয়ে ত্বকে এসে ত্বককে নরম মসৃন ও তৈলাক্ত রাখে। কোনও কারণে এই তৈলাক্ত পদার্থ উৎপাদনের হার বেড়ে গিয়ে এর নির্গমনের পথ বন্ধ হয়ে গেলে ব্রণের সৃষ্টি হয়। পরে জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এর তীব্রতা আরও বেড়ে যায়। তৈল গ্রন্থিগুলো মুখের ত্বকে বেশি থাকে তাই মুখের ত্বকেই ব্রণ বেশি হয়ে থাকে। তবে বুকে পিঠে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানেও ব্রণ হতে পারে। 'এন্ড্রোজেন' নামক এক ধরনের হরমোনের প্রভাবে তৈল গ্রন্থির উৎপাদন ও নিঃসরণ বেড়ে যায়। বয়ঃসন্ধি ক্ষণে এই হরমোনের কার্যকারিতা বেড়ে যায় এজন্য উঠতি বয়সে ব্রণ বেড়ে যায়। আবার ৪০/৪৫ বৎসর বয়স পর্যন্তও এই ব্রণ হতে পারে। কার ব্রণ হবে কার হবে না এবং কতটা বয়স পর্যন্ত ব্রণ থাকবে এটি আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। তবে যাদের মুখ তেলতেলে বেশি এদের ব্রণ

www.banglainternet.com

হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিক শুরু হওয়ার বয়স থেকে বন্ধ হওয়ার বয়স পর্যন্ত যে কোনও সময় ব্রণ হতে পারে। আবার বিভিন্ন শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রয়োজনের সাথে সাথে ব্রণের তীব্রতা বাড়ে কমে। যারা অতিরিক্ত মানসিক চাপে থাকেন কিংবা মেয়েদের মাসিকের পূর্বে, অতিরিক্ত কসমেটিকস্ সামগ্রী ব্যবহারের কারণেও ব্রণ বাড়তে পারে।

ব্রণ হলে বুঝবেন কিভাবে

ব্রণ দেখতে বিভিন্ন ধরনের হয়, যেমন– গুড়ি দানাদার, লালচে গোটা। গোটা আবার ইনফেক্শন হয়ে পুঁজসহ বড় বড় চাকাও হয়, এ অবস্থায় প্রচণ্ড ব্যথা হতে পারে। ব্রণ হলে উপযুক্ত চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন। অনেকে বলে থাকেন 'ব্রণ বয়সের দোষে হয়, সময়ে ভাল হয়ে যাবে', কথাটি ঠিক হলেও ব্রণ নিয়ে বসে থাকা ঠিক নয়। কারণ এতে করে ত্বকে স্থায়ী কালো দাগ পড়ে যায়। ত্বক উঁচু-নিচু এবড়ো খেবড়ো হয়ে যায়। অনেক সময় ত্বক ফুটো ফুটো হয়ে যায়। তাই ত্বককে সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এর চিকিৎসা করতে হবে।

ব্রণের চিকিৎসা

ব্রণের চিকিৎসা দীর্ঘস্থায়ী। ধৈর্য্য সহকারে এর চিকিৎসা করতে হবে। কারও কারও ব্রণ আপনা আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। যতদিন এমনি না ভাল হবে ততদিন চিকিৎসার মাধ্যমে উপদেশ ও ওষুধ দ্বারা তা আয়ত্বে রাখতে হবে। আজকাল বিভিন্ন ধরনের খাবার এবং লাগানোর জন্য ওষুধ ব্যবহার করা হয়। ব্রণের তীব্রতা এবং রোগীর শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক অবস্থার ওপর বিবেচনা করে ওষুধ দেয়া হয়। তবে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী ব্রণের চিকিৎসা হওয়া উচিত।

১। ব্রণের চিকিৎসায় খাওয়া দাওয়ায় তেমন কোনও বাছ বিচার নেই। সবই খাওয়া চলে।

২। কিছু কিছু চর্মরোগে সাবান লাগানো যায় না। তবে ব্রণের বেলায় তা উল্টো অর্থাৎ ব্রণ হলে দিনে দু'বার সাবান আর গরম পানি দিয়ে মুখ ধুতে হবে।

৩। অনেকের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্রণ খুটাখুটি করার অভ্যাস আছে। যা ইনফেক্শন হয়ে পরবর্তীতে কালো দাগের সৃষ্টি করে, তাই নখ কেটে ছোট রাখতে হবে এবং খুটাখুটি বন্ধ রাখতে হবে।

৪। যথেষ্ট পরিমাণে ভাল খেতে হবে। প্রচুর পানি খেতে হবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে ঘুমোতে হবে।

www.banglainternet.com

৫। ব্রণ চিকিৎসার সময় চিকিৎসকের নিকট শারীরিক কিংবা মানসিক কোনও সমস্যা থেকে থাকলে তাও জানাতে হবে। বিভিন্ন কারণে ব্রণ বাড়তে কমতে পারে।

একজিমা সারানোর উপায়

অনেকে মনে করে থাকেন ত্বকে যদি কোনও দীর্ঘস্থায়ী রোগ থেকেই থাকে তা হলো 'একজিমা'। এটি একটি অতি পরিচিত রোগ। একজিমা ত্বকের একটি প্রদাহ। এটি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। অনেক চর্মরোগের মধ্যে এটিও একটি রোগ।

একজিমার লক্ষণ

১। রোগের শুরুতে একজিমা কাঁচা থাকে, চুলকোয়, লালচে থাকে এবং রস ঝরতে থাকে।

২। অনেক দিন হয়ে গেলে পরে আক্রান্ত স্থানের ত্বক ধীরে ধীরে শুকনো ও শক্ত হয়ে যায়।

৩। ক্রমান্বয়ে ত্বক শক্ত ও বিবর্ণ হয়ে যায়।

৪। ছোট ছেলেমেয়েদের বেলায় গালে কিংবা ওপর বা নিচের হাতে লাল দাগ বা র‍্যাশ হয়। র‍্যাশে ছোট ছোট ঘা বা ফোস্‌কা থাকে। এগুলো ফেটে রস বের হয়।

৫। বড়দের ক্ষেত্রে একজিমা সাধারণ শুকনো দেখা যায় এবং হাঁটুর পেছনে কিংবা কনুইয়ের ভেতর বেশি দেখা যায়।

৬। এ রোগ সংক্রমণের মতো নয়, এলার্জির মতো।

দীর্ঘস্থায়ী একজিমার ক্ষেত্রে ছত্রাক জাতীয় জীবাণুও সংক্রমিত হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথমে ছত্রাকের চিকিৎসা করতে হবে, পরে একজিমার চিকিৎসা করতে হবে। একজিমা প্রধানত দুটো কারণে হয়ে থাকে। শরীরের বাইরের কারণে একজিমা হয়, আবার ভেতরের কারণেও হয়ে থাকে। বাইরের কারণ হচ্ছে ইমিটেশনের গহনা, সাবান ইত্যাদি। আবার সূর্যালোকের অতি বেগুনী রশ্মির প্রভাবে ত্বকের প্রদাহের কারণে হয়ে থাকে। শরীরের ভেতরের কারণে সৃষ্ট একজিমা ভাল হতে চায় না। তাই উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে কন্ট্রোলে রাখতে হবে। একজিমা যে কোনও বয়সেই হতে পারে। খুব ছোট অবস্থায় হলে মলম এবং তীব্র আকারের হলে খাবার ওষুধ পত্রের প্রয়োজন হতে পারে।

www.banglainternet.com

ঘরোয়া চিকিৎসা

১। র‍্যাশের ওপর ঠাণ্ডা সেঁক দিতে হবে।

২। সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দিলে পাঁচড়ার মতো চিকিৎসা করতে হবে।

৩। একজিমার দাগের ওপর রোদ লাগাতে হবে।

৪। ডাক্তারী পরামর্শ মতো মলম লাগাতে হবে।

মনে রাখা উচিত, দীর্ঘস্থায়ী চর্মরোগ মানেই একজিমা নয়। কাজেই চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতিত কোনও ওষুধ ব্যবহার করা মোটেও উচিত নয়।

মাথার ছত্রাক (ফাংগাস) রোগ

ছত্রাক ইনফেক্শন শরীরের যে কোনও স্থানে হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, গ্রীষ্ম প্রধান এলাকা, শরীর দুর্বলকারী রোগসমূহ, ছত্রাক আক্রান্ত পশু সংস্পর্শতা প্রভৃতি অন্যতম।

যখন মাথায় ছত্রাকের আক্রমণ ঘটে তখন প্রাথমিক অবস্থায় চুলে সংক্রমণ হয়। এটি সাধারণত শিশুদের ক্ষেত্রে বেশি হয়। বড়দের বেলায় খুব কমই এ রকম দেখা যায়। কারণ বড়দের তৈলগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত তেল ছত্রাকের আক্রমণ থেকে মাথার ত্বককে রক্ষা করে। এ রোগ এক শিশু থেকে আরেক শিশুর মাথায় সংক্রমিত হয়। ছত্রাকের জীবাণু বিভিন্ন রকম জিনিসের মধ্য থেকে থাকে যেমন– নাপিতদের যন্ত্রপাতি, চুলের ব্রাশ, মাথার টুপি ইত্যাদিতে।

কিভাবে মাথায় ছত্রাকের লক্ষণ বুঝতে পারবেন

১। ধূসর রঙের মরা কোষের মতো সীমিত এলাকা জুড়ে অবস্থান। যেখানে চুলকানি থাকবে। আক্রান্ত এলাকায় হয়তো চুল থাকবে না। সমস্ত মাথা জুড়েও ছত্রাক হতে পারে, আবার নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায়ও হতে পারে।

২। আক্রান্ত এলাকার চুল ছড়িয়ে থাকবে এবং রুক্ষ, অনুজ্জ্বল ও ভঙ্গুর হবে।

৩। অনেক সময় কালো ফোটার ন্যায় দেখা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে চুলকানি ও মরা কোষের পরিমাণ কম থাকে।

৪। শিশুর মাথায় অনেক সময় একটি তেলতেলে, হলদে রঙের ছাল হয়ে থাকে। চামড়াটা লাল রঙের হয়ে থাকে, আক্রান্ত এলাকায় গন্ধ থাকতে পারে।

চিকিৎসা

১। যেহেতু ছত্রাকের বৃদ্ধি গরম, আদ্র ও স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে হয়ে থাকে তাই ঐ সকল কারণ দূর করতে না পারলে ছত্রাক ভাল হবে না।

২। ওষুধ যুক্ত শ্যাম্পু সপ্তাহে দু'দিন মাথায় ব্যবহার করতে হবে।

www.banglainternet.com

৩। বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক বিরোধী যে ক্রিম আছে তা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে মুখেও ওষুধ খেতে হবে।

৪। আজকাল বাজারে অনেক ছত্রাক নাশক ওষুধ রয়েছে। এগুলোর সঠিক ব্যবহার, মাত্রা, সময়কাল, চিকিৎসক থেকে জেনে তারপর ব্যবহার করা উচিত।

৫। শিশুর মাথা হাওয়ায় রোদে খুলে রাখতে হবে।

৬। রোগটি প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা করানোই ভাল।

৭। একই পরিবারের সমস্ত সদস্যকে পরীক্ষা করা উচিত যে, তাদের এ রোগ রয়েছে কি-না এবং থাকলে সে অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

চুলের খুশকি ও উকুন

খুশকি সমস্যা সারা বিশ্বেই কম বেশি আছে। আমাদের দেশে খুশকির সমস্যা বেশ প্রকট। প্রতিটি মানুষই কখনও না কখনও খুশকির সমস্যায় ভুগে থাকে। শারীরিক সমস্যার চেয়ে মানসিক ও সামাজিক বিড়ম্বনাই এ সমস্যায় বেশি। তাই উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত।

খুশকি হলো মাথার ত্বকের মৃত কোষ। আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষই প্রতিনিয়ত স্বাভাবিক নিয়মে ঝরে যাচ্ছে। কিন্তু এ প্রক্রিয়া এত সূক্ষ্ম যে আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু আমাদের মাথার ত্বক পুরু হওয়াতে এ কনাগুলো বড় হয়ে থাকে এবং তা ঘাম, ধুলো ময়লা এবং তৈলগ্রন্থির গোড়ায় এসে আটকে যায়। কখনও মাথার ত্বকের ঝরে পড়ার গতি স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে গেলে খুশকিও বেড়ে যায়। তৈলগ্রন্থি মাথার ত্বকেই বেশি থাকে। তাই তৈলগ্রন্থি হতে তৈলাক্ত পদার্থের উৎপাদন ও নিঃসরণ বেড়ে গেলেও বিপত্তি ঘটে থাকে। শীতের দিনে সাধারণত খুশকি বেশি হয়ে থাকে। খুশকির সমস্যা বয়স্কদের তুলনায় কম বয়সীদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। মাথায় খুশকি হলে চুলকানির মাত্রা বেড়ে যায় এবং চুল পড়তে থাকে। যদি জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে পরবর্তীতে প্রদাহের সৃষ্টি হয়ে তীব্র আকার ধারণ করে। কিন্তু মাথা চুলকালে, মাথার চুল উঠলে কিংবা আঁশ উঠলেই যে তা খুশকি হবে এরকম ভাবা ঠিক নয়। আমাদের শরীরের ত্বকে যেমন নানা ধরনের চর্মরোগ হয়ে থাকে, মাথার ত্বকেও তেমনি হয়ে থাকে। মাথার ত্বকে খুশকি ছাড়াও একজিমা কিংবা ফাংগাস ইনফেক্শন ইত্যাদি হয়ে থাকে। তাই মাথার ত্বকে কোনও সমস্যা হলে খুশকি বলে ধরে না নিয়ে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

www.banglainternet.com

খুশকির চিকিৎসা

১। চুলকে খুশকিমুক্ত রাখতে হলে নিয়মিত ভাল শ্যাম্পু ও সাবান দিয়ে চুলকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

২। চিরুনী দিয়ে দিনে কয়েকবার চুল আঁচড়াতে হবে এবং নিজের জন্য পৃথক চিরুনী রাখতে হবে।

৩। চুল যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ফেলতে হবে।

৪। মাথায় বেশি তেল ব্যবহার করা ঠিক নয়। অনেকে চুলে তেল দিয়ে খুশকি ধামাচাপা দেয়ার ব্যবস্থা করেন। তেল দিলে খুশকি কমে এ ধারণা ভুল। বরঞ্চ তেল দিলে চুল ভেজা ও স্যাঁতস্যাঁতে থাকায় চুলে ময়লা ও খুশকি আটকে গিয়ে সমস্যা বাড়ায়।

৫। মাথার ত্বক নিয়মিত পরিষ্কার করার জন্য নিয়মিত শ্যাম্পু ব্যবহার করাই উত্তম। সাবানের চেয়ে মাথার ত্বক পরিষ্কার করার জন্য শ্যাম্পুই উত্তম।

৬। খুশকি যদি হয়েই যায় তবে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে তার চিকিৎসা করতে হবে। অনেকে মনে করে থাকেন খুশকির কোনও চিকিৎসা নেই। আবার অনেকে ভেবে থাকেন যে, খুশকির চিকিৎসার কোনও প্রয়োজন নেই। এ দুটো ধারণাই ভুল।

৭। খুশকির জন্য আজকাল অনেক ওষুধ বের হয়েছে। তীব্রতা ও উপসর্গ লক্ষ্য রেখে একেকজনের বেলায় একেক ধরনের চিকিৎসা করতে হবে।

খুশকি প্রতিকারে কিছু ঘরোয়া চিকিৎসা

১। দই, পাতিলেবুর রস, নিমপাতা বাটা এবং গোলমরিচ মাথায় ও চুলে লাগিলে এক ঘণ্টা রেখে দিতে হবে। এরপর মাথা ধুয়ে ফেলতে হবে, এভাবে সপ্তাহে একবার এটি করতে হবে।

২। কিছুটা আমলকী ও রিঠাফল রাত্রে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরদিন ঐ পানি দিয়ে মাথা ও চুল ধুয়ে ফেলতে হবে। এটি সপ্তাহে দু'দিন করতে হবে।

উকুন

উকুন মাথার ত্বকের এবং চুলের আরেকটি বড় সমস্যা। এটি এক ধরনের পরজীবী জীবাণু। মাথায় উকুন হলে তা থেকে চুলকানির সৃষ্টি হয়। মাথার ত্বকে ছোট ইনফেক্শন, ক্ষত এবং প্রদাহ হতে পারে। ছেলেদের চুল থেকে মেয়েদের

www.banglainternet.com

চুল বড় থাকে বিধায় মেয়েদের চুলে বেশি উকুন দেখা যায়। বাড়িতে যদি কারও মাথায় উকুন থেকে থাকে, তবে একই বিছানায় শোবার কারণে উকুন হয়। আক্রান্তজনের চিরুনী যদি অন্যজন ব্যবহার করে থাকে তাহলেও উকুন হয়। এজন্য উকুন সারাতে হলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে। উকুন হলে ঘন ঘন চুল পরিষ্কার করতে হবে। যার উকুন হয়েছে তাকে অন্যদের সাথে ঘুমোতে দেওয়া যাবে না।

ঘরোয়া চিকিৎসা

১। কেরোসিন তেল ও মাথার তেল সম পরিমাণে মাথায় লাগাতে হবে।

২। সমস্ত মাথার চুলে যাতে তেল ভালভাবে লাগে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৩। তেল লাগানোর পর একটি কাপড় দিয়ে চুলগুলো জড়িয়ে রাখতে হবে।

৪। এরপর রিঠা মিশ্রিত পানি দিয়ে চুল পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

৫। সরু চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াতে হবে এবং উকুনগুলো বের করে মেরে ফেলতে হবে।

৬। উকুনের ডিম যদি থাকে তবে গরম পানি ও ভিনিগারে আধ ঘণ্টা ভিজিয়ে সরু চিরুনি দিয়ে আঁচড়াতে হবে।

৭। এভাবে প্রতি ১০ দিন অন্তর অন্তর এটি করতে হবে।

www.banglainternet.com

Goto List >

চতুর্দশ অধ্যায়
বিষক্রিয়া

অস্বাভাবিক মৃত্যুগুলোর মধ্যে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু একটি অন্যতম প্রধান কারণ।

দুর্ঘটনাবশতঃ কিংবা অজ্ঞতা ও অসাবধানতার জন্য লোকে বিষ খেয়ে থাকে। যেমন– কেরোসিন, পেট্রোল, সোডা ইত্যাদি দ্রব্য তরল খাবারের সাথে রাখলে শিশুরা অসাবধানতা বশে খেয়ে ফেলতে পারে।

আত্মহত্যার জন্য কিংবা অন্যকে হত্যার জন্যও অনেক ক্ষেত্রে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটে। অনেক সময় ইনজেক্শনের মাধ্যমে বিষক্রিয়া ঘটে তাকে। গ্যাস জাতীয় বিষ শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে ভেতরে ঢুকে মৃত্যু ঘটাতে পরে। সুয়ারেজ ট্যাঙ্কের বিষাক্ত গ্যাস, গভীর অব্যবহৃত কূপের বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদি থেকে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু ঘটে। আবার অগ্নিকাণ্ডের ফলে বদ্ধ ঘরে এক ধরনের বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি হয় এবং ঐ স্থানে আটকে পড়া লোকের মৃত্যু ঘটে। অনেক কীটনাশক ওষুধ জমিতে দেয়ার সময় এবং দীর্ঘক্ষণ এ কাজে থাকার ফলে ত্বকের ভেতরে ওষুধ প্রবেশ করে মৃত্যু ঘটাতে পারে।

সাধারণত যে বিষগুলোর কারণে অধিক মৃত্যু ঘটে থাকে

১। ইঁদুর মারার বিষ।
২। যে কোনও ওষুধ মাত্রাধিক সেবন।
৩। কেরোসিন, ডিজেল কিংবা পেট্রোল খেলে।
৪। আরসেনিকে আক্রান্ত হয়ে।
৫। ডি. ডি. টি. কিংবা অন্য কোনও কিটনাশক ওষুধের জন্য।
৬। ধুতুরার বিষ প্রয়োগে।
৭। মদ, গাঁজা কিংবা হিরোইন ইত্যাদি মাত্রাতিরিক্ত সেবন করে ফেললে।
৮। উগ্র ক্ষার কিংবা কড়া এসিড।
৯। বিভিন্ন বিষোধক দ্রব্য।

www.banglainternet.com

১০। অতিরিক্ত ধূমপান করলে।

১১। টিংচার আয়োডিন।

প্রাথমিক চিকিৎসার পদ্ধতি

১। বিষ খেলে যদি লোকটির জ্ঞান থাকে তবে বমি করানোর চেষ্টা করা উচিত। রোগীর গলায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করাতে হবে।

২। অনেক লবণ মিশিয়ে গরম পানি খাওয়াতে হবে।

৩। ডিমের সাদা অংশ ও কুসুম ফেটে তা খাইয়ে দিতে হবে।

৪। কাঁচা সরষের তেল খাইয়েও বমি করানো যায়।

৫। বমি করানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বমি ফুসফুস বা শ্বাসনালীতে প্রবেশ না করে। সেজন্য রোগীর মাথা কিছু নিচের দিকে কাত করে রাখতে হবে।

বিষক্রিয়াতে করণীয়

১। রোগীকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

২। তাৎক্ষণিক মেডিকেল সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। রোগী যখন বমি করে তখন সেই বমি কোনও পাত্র, কাগজ কিংবা নিকটে কোনও শিশি বোতল থাকলে তাতে সংগ্রহ করতে হবে। যাতে করে কখন, কি ও কতটুকু বিষয় খেয়েছে তা যেন ডাক্তার জানতে পারে।

৪। রোগী যদি অজ্ঞান থাকে তবে রোগীকে উপুড় করে শুইয়ে দিতে হবে এবং মাথা একদিকে ফিরিয়ে রাখতে হবে। মাথায় কোনও বালিশ ব্যবহার করা যাবে না, যদি বেশি বমি করে জামাকাপড় ভিজিয়ে ফেলে তবে তা সরিয়ে দিতে হবে।

৫। শ্বাস প্রশ্বাস ও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ থাকলে কৃত্রিম পদ্ধতিতে চালু করতে হবে।

৬। রোগী ঝিমিয়ে পড়লে তাকে জাগিয়ে রাখতে হবে।

৭। শক্ হলে তার প্রতিকার করতে হবে।

৮। উপযুক্ত নিরোধক পাওয়া গেলে তা প্রয়োগ করতে হবে।

কোন্ কোন্ অবস্থায় বমি করানো যাবে না

১। রোগী যদি এসিড খেয়ে থাকে তবে রোগীকে প্রচুর পরিমাণে পানি, দুধ, ডিমের সাদা অংশ ইত্যাদি খাওয়াতে হবে। রোগী যদি সাথে সাথেই বমি করে

www.banglainternet.com

তখন বিপদ কমে গিয়েছে মনে করতে হবে। কারণ কড়া এসিড তখন দ্রবিভূত হয়ে যায়।

২। রোগী যদি গ্যাস জাতীয় বিষ দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে প্রথমেই রোগীকে খোলামেলা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। রোগীর পরিধেয় বস্ত্র ঢিলা করে দিতে হবে। শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে কৃত্রিম উপায়ে চালিয়ে যেতে হবে।

৩। এলকালি কিংবা ক্ষার দ্বারা বিষক্রিয়া ঘটলে প্রচুর পানি, দুধ এবং টক জাতীয় সরবত যেমন– লেবুর সরবত, কমলার রস ইত্যাদি খাওয়াতে হবে। ওগুলো খাওয়ার পর যদি রোগী বমি করে তবে বিপদ অনেকটা কেটে যাবে।

৪। কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করার সময় নাকে মুখে গামছা বেঁধে হাতে দস্তানা পরে নিলে ভাল হয়। যদি হাতে কিংবা গায়ে ওষুধ লেগেই যায় তবে সাথে সাথে ধুয়ে ফেলতে হবে।

www.banglainternet.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

সাপের কামড়

সাপে কামড়ালেই মানুষ ধরে নেয় বুঝি বিষাক্ত সাপে কামড় দিয়েছে। অধিকাংশ সাপই বিষাক্ত নয়। বিষাক্ত সাপ চেনার উপায় হচ্ছে বিষাক্ত সাপের ওপরের চোয়ালে অবস্থিত বিষ থলিতে বিষ সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে। বিষাক্ত সাপের দুটি বিষ দাঁত থাকে। এ দাঁতগুলো ভেতরের দিকে বাঁকা থাকে। বিষ দাঁতে দুটো ছিদ্র থাকে এই ছিদ্র বিষ থলির সাথে যুক্ত থাকে। সাপ যখন দংশন করে তখন বিষ থলি থেকে বিষ ছিদ্র দিয়ে মানব বা অন্য কোনও প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে।

বিষাক্ত সাপ বোঝবার উপায়

১। বিষাক্ত সাপের কামড়ে দুটি বিষ দাঁতের দাগ থাকে। আর কখনও ছোট ছোট দাঁতের দাগও থাকে।

২। আক্রান্ত স্থানে অত্যধিক যন্ত্রণা হতে পারে।

৩। রক্তে কতটা বিষ ঢুকেছে তার ওপর নির্ভর করে জায়গাটা কতটুকু ফুলে ওঠেছে তার ওপর।

৪। আক্রান্ত স্থানে ঝি ঝি ধরে।

৫। কামড়ের স্থানের চারিদিকে চামড়ার রঙ বদলে যায়।

৬। রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে।

৭। রোগীর ঘুম ঘুম ভাব হয়।

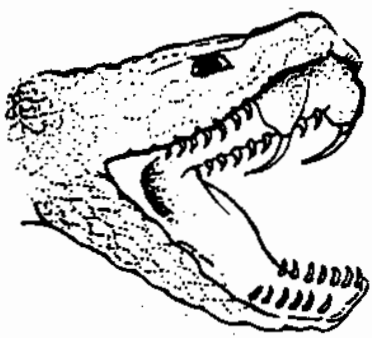

বিষধর সাপের বিষক্রিয়া শরীরে যেসব প্রতিক্রিয়া ঘটায়

১। স্নায়ুকে আক্রমণ করে।

২। পেশীতে পক্ষাঘাত ঘটায়।

৩। রক্ত কনিকার ক্ষতি সাধন করে।

৪। মস্তিষ্কের ক্ষতি সাধন করে থাকে।

৫। রোগী শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যেতে পারে।

সাপের কামড়ের স্থানে গতানুগতিক লক্ষণগুলো

১। রোগীর রক্ত সঞ্চালনে বাধার সৃষ্টি হয়।

২। রক্তচাপ কমে আসে এবং নাড়ীর গতি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে।

৩। রোগীর শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয় এবং সেই সাথে তীব্র পানির পিপাসা হতে পারে।

৪। মাথা ধরে ও মাথা ঘোরে।

৫। গা বমি বমি ভাব হয়।

৬। রক্ত বমিও হতে পারে।

বিষাক্ত সাপের কামড়ের চিকিৎসা

১। বিষাক্ত সাপে কামড়ালে রোগীকে যতটা সম্ভব শান্ত রাখতে হবে। রোগী যাতে কিছুতেই নড়াচড়া না করে কারণ নড়াচড়া করলে বিষ ছড়িয়ে পড়তে পারে। এজন্য রোগীকে হাঁটা চলা করতে দেওয়া উচিত নয়।

২। বিষ দাঁতের ২ থেকে ৩ ইঞ্চি ওপরে আক্রান্ত স্থানের চারদিকে কাপড় দিয়ে বাঁধতে হবে। খুব বেশি শক্ত করে বাঁধা যাবে না। আধ ঘন্টা পর পর ১ মিনিটের জন্য বাঁধন আলগা করে দিতে হবে।

৩। ক্ষতস্থানের ত্বক ছেদন করে বিষ অপসারণ করতে হবে।

৪। প্রথমে ছুরিকে আগুনের শিখায় জীবাণুমুক্ত করে নিয়ে জখমের স্থানে এক সেঃ মিঃ লম্বা এবং অর্ধ সেঃ মিঃ গভীর করে ত্বক ছেদন করতে হবে।

৫। এরপর আপনার মুখে এবং দাঁতে যদি ঘা না থাকে তবে ১৫ মিনিট ধরে বিষটা চুষে থু করে ফেলে দিতে হবে।

৬। মনে রাখতে হবে, ছেদন যেন খুব বেশি গভীর না হয়। কারণ বিষ যদি শিরার রক্তের সাথে মিশে তবে তা হৃদপিণ্ডের মাধ্যমে মস্তিষ্কে গিয়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটাবে।

www.banglainternet.com

৭। মুখে বিষ চোষার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। অন্য কোনও পাম্পারের সাহায্যেও সাক করা যেতে পারে।

৮। আক্রান্ত স্থানে বরফ দিতে হবে। বরফ পাওয়া না গেলে কাপড়ের কয়েক টুকরো মুড়ে যে জায়গায় কামড়েছে তার চারপাশে গুঁজে দিতে হবে।

৯। অতিসত্বর হাসপাতালে পাঠাতে হবে। এবং ওপরের লক্ষণগুলো দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ মতো এন্টিভেনিনের ইনজেক্শন দিতে হবে।

তাই বিষাক্ত সাপে কামড়ালে ডাক্তারি সাহায্য চাইতে হবে। সেই সাথে প্রাথমিক চিকিৎসাও চালিয়ে যেতে হবে।

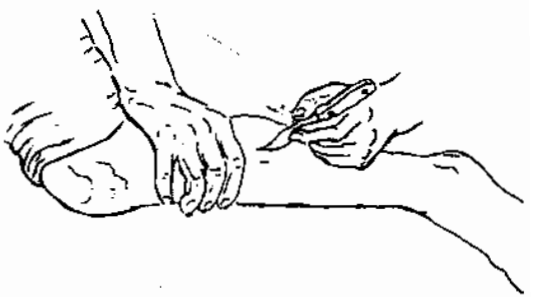

বিষাক্ত কীট পতঙ্গের দংশন

ভীমরুল, বোলতা, কাঁকড়া, বিছা ইত্যাদি কীটগুলো মানুষকে দংশন করে থাকে। দংশিত স্থানে জ্বালা যন্ত্রণা হতে থাকে। যদি শক্ হয়ে থাকে তবে শক্ থেকে রোগী মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করতে পারে। শুঁয়োপোকা হলে আক্রান্ত স্থান চুলকোতে থাকে।

প্রাথমিক চিকিৎসা

১। যদি ভীমরুল কিংবা বোলতা কামড় দেয়, তবে ছুরি কিংবা সূঁচ দিয়ে এগুলোর হুল বের করতে হবে। এরপর ক্ষতস্থানে লবণ-পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

www.banglainternet.com

Goto List >

২। শুঁয়োপোকা কামড়ালে হুলগুলো ব্লেড দিয়ে চেঁছে এরপর চুন লাগিয়ে দিতে হবে।

৩। বিষাক্ত কোনও কীট হলে তবে ঐ স্থানে লেবুর রস লাগিয়ে তার ওপর চুন লাগিয়ে দিতে হবে।

৪। আক্রান্ত স্থানে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে বরফ পানির পট্টি দিতে হবে, এন্টিহিস্টামিন বড়িও দেওয়া যায়।

৫। প্রয়োজনে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ডাক্তার প্রয়োজন মনে করলে এ্যানেসথেসিয়ান ইনজেক্শন বা ক্রিম দেবেন কিংবা ব্যথানাশক কোনও ওষুধ দেবেন। এতে রোগী আরাম বোধ করবে।

৬। হুল ফোটানার জায়গায় গরম সেঁক দিতে হবে।

৭। যন্ত্রণার জন্য এসপিরিন দিতে হবে।

৮। শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে মুখে মুখ দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস চালাতে হবে।

৯। রোগী শক্ প্রাপ্ত হলে এলার্জির শকের মতো চিকিৎসা করতে হবে।

www.banglainternet.com

ষোড়শ অধ্যায়

গলায় কোনও খাদ্য দ্রব্য কিংবা অন্য কোনও জিনিস আটকালে

খাবার সময় খাদ্য দ্রব্য শ্বাসনালীতে আটকে শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হতে পারে। আবার গলায় মাছের কাঁটা কিংবা মাংসের হাঁড়ও আঁটকাতে পারে। কিংবা ছোট শিশুরা যদি মার্বেল, পয়সা ইত্যাদি নিয়ে খেলা করে এগুলো তবে খেলার সময় গলায় আঁটকে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। এ সময় রোগী অস্থির হয়ে পড়ে মুখমন্ডল ও মাথা ঘামতে থাকে। মুখ দিয়ে কথা বলতে পারে না। এই অবস্থায় কখনও রোগী শক্ প্রাপ্ত হয়ে অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে। এজন্য এ সময় সঠিক ব্যবস্থা নিতে হবে। মাছের কাঁটা বিঁধলে ভাত, কলা, চিড়া, মুড়ি ১/২ গ্লাস পানির সাথে গিলে খেলে কাঁটা নিচে নেমে যাবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা

১। রোগীকে উপুড় করে জোরে কাশি দিয়ে আটকে যাওয়া বস্তু বের করার চেষ্টা করতে হবে।

২। রোগী যদি সাহায্যকারীর চাইতে ছোট হয় তবে তার পেছনে দাঁড়িয়ে কোমরটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে হবে।

৩। এরপর সাহায্যকারীর হাতের মুঠি তার পেটের ওপর নাভির থেকে ওপরে কিন্তু পাঁজরের নিচে রাখতে হবে।

৪। এরপর রোগীকে ওপরের দিকে ঝাঁকি দিতে হবে এবং সেই সাথে পেটে চাপ দিতে হবে। এতে করে রোগীর ফুসফুস থেকে বাতাসটা বেরিয়ে গেলে আস্তে গলাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এভাবে কয়েক বার এরকম করতে হবে।

৫। রোগীর কোমর ভাঁজ করে সামনের দিকে উপুড় এবং মাথা নিচু অবস্থায় পিঠে কয়েকবার চাপড় দিলে আটকে যাওয়া বস্তু বেরিয়ে যাবে।

৬। রোগী যদি অজ্ঞান হয়ে যায় তবে তাকে চিৎ করে শোয়াতে হবে এরপর রোগীর ওপরে বসতে হবে। হাতের চেটোর গোড়াটা তার পেটের নাভি আর পাঁজরের মাঝখানে রাখতে হবে।

www.banglainternet.com

Goto List >

৭। মট্ করে ওপরের দিকে ঠেলা দিতে হবে। এভাবে কয়েকবার করতে হবে।

৮। যদি রোগীটি শ্বাস প্রশ্বাস না নিতে পারে তবে কৃত্রিম উপায়ে মুখে মুখ লাগিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস চালাতে হবে।

৯। অতি দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে।

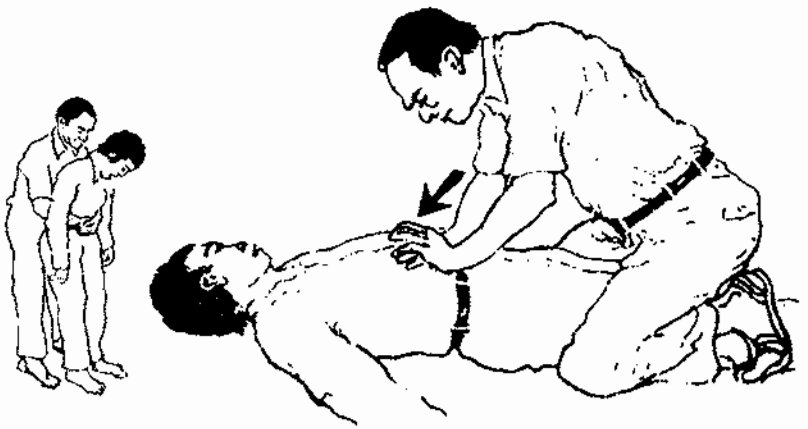

নাকে কিংবা কানে কিছু ঢুকলে

শিশুদের নাকে অনেক সময় খেলতে গেলে কিছু ঢুকে যেতে পারে যেমন— মার্বেল কিংবা কোনও ফলের বিচী জাতীয় পদার্থ।

করণীয়

১। এ সময় রোগীকে মুখ দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে বলতে হবে।

২। নাকের যে পাশের ছিদ্রে কিছু ঢোকেনি সেই ছিদ্র ও মুখ বন্ধ রেখে আক্রান্ত নাক দিয়ে জোরে শ্বাস ছাড়তে বলতে হবে। এতে নাকের ভিতরে যদি কিছু আটকে থাকে তবে তা বেরিয়ে আসবে।

৩। যদি জিনিসটি বের না হয়। তবে খোঁচাখুঁচি না করে অতি সত্বর হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

www.banglainternet.com

অনেক শিশুর কানে কিছু ঢোকানোর অভ্যাস থাকে। এছাড়াও অনেকের কানে কীটপতঙ্গ ঢুকতে পারে।

আক্রান্ত কান ওপরের দিকে রেখে রোগীকে কাত করে শুইয়ে দিতে হবে এবং কুসুম গরম পানি কানের মধ্যে ঢালতে হবে। এতে কানে কিছু ঢুকে থাকলে তা পানির সাথে বেরিয়ে আসবে।

এরপরও যদি কানে কিছু থেকে যায় তবে অতি সত্বর রোগীকে হাসপাতালে নিতে হবে, অযথা কানে খোঁচাখুঁচি করা যাবে না।

www.banglainternet.com

Goto List >

সপ্তদশ অধ্যায়

কয়েকটি খুব সাধারণ রোগ ও তার ঘরোয়া প্রতিকার

সর্দিজ্বর

সর্দি জ্বর সাধারণ ভাইরাসের সংক্রমণ। এই জ্বরকে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরও বলা হয়ে থাকে। ভাইরাস জ্বর হলে নাক দিয়ে পানি পড়ে, গলা ব্যথা হয়, কখনও কখনও জ্বর হয় এবং গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে পাতলা পায়খানাও হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর হলে সব সময় ওষুধের প্রয়োজন পড়ে না। ওষুধ ছাড়াই নির্দিষ্ট সময়ে ভাল হয়ে যায়। তবে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর যদি এক সপ্তাহের বেশি থাকে এবং কফ থাকে তবে ডাক্তারের পরামর্শ মতো এন্টিবায়োটিক খেতে হবে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে কিছু ঘরোয়া চিকিৎসা

১। প্রচুর পানি পান করতে হবে এবং যথেষ্ট বিশ্রাম নিতে হবে।

২। প্যারাসিটামল ট্যাবলেট জ্বর নামাতে, গায়ের ব্যথা ও মাথাধরা কমাতে সাহায্য করে। কাজেই বেশি ওষুধ খেলে জ্বর তো ভাল হবেই না অযথা পয়সা নষ্ট হবে।

৩। সর্দিতে যদি নাক বন্ধ হয়ে থাকে তবে গরম পানির ভাপ নিতে হবে। এতে নাক, গলা সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

www.banglainternet.com

৪। ভিটামিন 'সি' জাতীয় ফল, যেমন– কমলালেবুর রস, পাতিলেবুর রস ইত্যাদি ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের পথ্য।

সর্দি হলে কি করবেন

১। সর্দি হলে ভিটামিন 'সি' যুক্ত ফল খেতে হবে, যেমন– কমলালেবু, টমেটো, আমলকী, পাতিলেবু ইত্যাদি।

২। অনেকে মনে করেন ভিজলে সর্দি হয়। কিন্তু এই প্রচলিত ধারণাটি ভুল। ভিজলে সর্দি হয় না– সর্দি বাড়ে। সংক্রমিত লোকের হাঁচির সাথে যে ভাইরাস বাতাসে ছড়ায় সেখান থেকেই সুস্থ লোকের সংক্রমণ ঘটে।

৩। ঘরে যদি কারও সর্দি থাকে তবে তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে শোয়াতে হবে। ছোট বাচ্চাদেরকে একটু বিশেষ সাবধানে রাখতে হবে।

৪। গলা ব্যথা হলে বিশেষ ওষুধের প্রয়োজন নেই। গরম পানি দিয়ে কুলকুচা করলে ভাল হয়ে যায়। তবে জ্বরের সাথে যদি প্রচণ্ড গলাব্যথা হয় তবে ডাক্তারের পরামর্শ অনযায়ী এন্টিবায়োটিকের ব্যবস্থা করতে হবে।

সাইনোসাইটিস

আমাদের নাকের চারপাশে যে হাড়গুলো আছে, এই হাড়গুলোর মাঝে অনেক দিনের পুরনো প্রদাহ হলে তাকে সাইনোসাইটিস বলে।

লক্ষণ বোঝার উপায়

১। নাকে সব সময় ঘন সর্দি থাকে এবং পুঁজে নাক ভর্তি হয়ে থাকে। এই সর্দিতে গন্ধ ও থাকে।

২। চোখের ওপরের ও নিচের হাড়ে ব্যথা থাকে। হাঁটতে গেলে কিংবা ঝুঁকলে মাথায় ব্যথা লাগে।

৩। ব্যথার সাথে অনেক সময় জ্বরও থাকে।

প্রাথমিক চিকিৎসা

১। নাক বন্ধ থাকলে তা সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে। ছোট ছেলেমেয়েদেরকে ড্রপার দিয়ে নাক পরিষ্কার করে দিতে হবে।

২। যে সব ছেলেমেয়েরা একটু বড় তারা লবণের পানি নাকে টেনে নিলে নাক পরিষ্কার হয়ে যাবে।

৩। গরম পানির ভাঁপ নিলেও নাক পরিষ্কার হয়।

www.banglainternet.com

৪। মুখের ওপরও গরম সেঁক নেওয়া ভাল।

৫। নাক দিয়ে পানি ঝরলে নাক না ঝেড়ে মুছে ফেলতে হবে। এরপর নাক পরিষ্কার করার ওষুধ দেওয়া যেতে।

৬। এরপরও যদি নাক পরিষ্কার না হয় তবে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এন্টিবায়োটিক খেতে হবে।

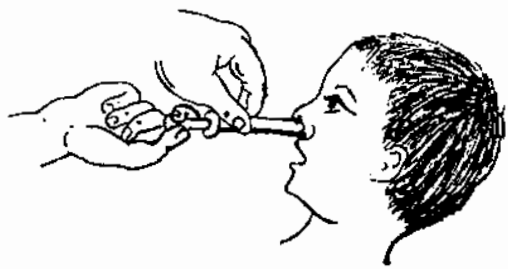

গলায় ব্যথা আর টনসিলের প্রদাহ

সাধারণ সর্দি জ্বর থেকে টনসিলের প্রদাহ শুরু হয়। প্রথমে সাধারণ গলাব্যথা থাকে, গলার ভেতরটা লাল থাকে এবং ঢোক গিলতে অসুবিধা হয়। টনসিলের ভেতরটা ফুলে যায়। টনসিলের প্রদাহ থেকে প্রচণ্ড জ্বর ওঠে। এক ধরনের টনসিল আছে যা মুখ গহ্বরের পেছনের দিকে জিহ্বার দুই দিকে অবস্থান করে। যা মুখ হা করলেই আমরা সবাই দেখতে পাই। আবার আরেক ধরনের টনসিল আছে যা নাকের পেছনে এবং গলার উপরিভাগে অবস্থান করে। এই টনসিল ইনফেকশন ২ থেকে ১০ বছরের শিশুদের মধ্যে বেশি হয়ে থাকে।

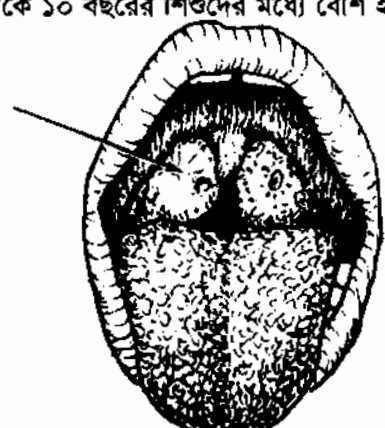

www.banglainternet.com

এই রোগের লক্ষণ

শিশুরা নাক দিয়ে শ্বাস নিতে পারে না বিধায় মুখ দিয়ে শ্বাস নিয়ে থাকে। খেতে গেলে অসুবিধা হয়। অনেকে খেতে গেলে অনীহা প্রকাশ করে এবং ঘুমোনোর সময় নাক ডেকে থাকে। অনেক সময় শিশুদের মুখ দিয়ে লালা নির্গত হয় ফলে শিশুদের মুখ শুকিয়ে যায়। শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

এ অবস্থায় শিশুরা কানে কম শোনে। এরা মনের দিক থেকে দুর্বল থাকে এবং স্মরণশক্তিও লোপ পেতে থাকে। এ ধরনের উপসর্গ দেখা দিলে মায়েদের উচিত অবশ্যই নাক, কান ও গলা রোগ বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হওয়া। বেশি উপসর্গ দেখা দিলে অবশ্যই তাকে অপারেশন করিয়ে নিতে হবে।

টনসিলের ঘরোয়া চিকিৎসা

এক গ্লাস গরম পানিতে এক চামচ লবণ দিয়ে কুলকুচা করতে হবে।

ব্যথার জন্য ট্যাবলেট খেতে হবে।

ব্যথা আর জ্বর হঠাৎ হলে এবং তিন দিনের বেশি হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

রিউম্যাটিক ফিভার (বাতজ্বর)

এই রোগ সাধারণত কমবয়েসী ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশি হয়ে থাকে। যাদের বার বার টনসিলের প্রদাহ হয় এদের বাতজ্বর হবার সম্ভাবনা থাকে। ঠাণ্ডা আবহাওয়া, ঘনবসতি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে ছেলেমেয়েরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ

১। বাতজ্বর হলে প্রায়ই জ্বর হতে দেখা যায়।

২। শরীরের গাঁটগুলো, যেমন– কব্জি, হাঁটু এবং কনুইয়ে ব্যথা দেখা যায়। গাঁটগুলো ব্যথা হয় এবং ফুলে যায়।

৩। চামড়ার নিচে দলা দলা দেখা যায়।

৪। রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায় এবং বুকেও ব্যথা হতে পারে।

৫। রোগীর খাওয়ার রুচি কমে যায় এবং শরীরের ওজন দিন দিন কমতে থাকে।

চিকিৎসা

বাতজ্বর হলে চিকিৎসকের পরামর্শ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিতে হবে। নতুবা হার্টের ক্ষতি হতে পারে।

(ক) প্রয়োজনে কিছুদিনের জন্য পূর্ণ বিশ্রাম দরকার হতে পারে।

www.banglainternet.com

(খ) জ্বর ও ব্যথা দমনের জন্য প্যারাসিটামল খেতে দেওয়া যেতে পারে।

(গ) সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

(ঘ) স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদেরকে মাঝে মধ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং যাদের টনসিলাইটিস বা ফ্যারেনজাইটিস আছে এদের উপযুক্ত চিকিৎসা করতে হবে।

(ঙ) বাড়ি ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে হবে। নোংরা পরিবেশ বর্জন করতে হবে।

(চ) ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া অযথা Steroid জাতীয় ওষুধ খাওয়া যাবে না।

হাঁপানি

হাঁপানি রোগীর যখন তখন শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায়। শ্বাস ছাড়ার সময় সাঁই সাঁই শব্দ হয়। হাঁপানি রোগী যখন শ্বাস নিতে যায় তখন রোগীর কণ্ঠার পেছনের আর পাঁজরের মাঝের চামড়া ভেতর দিকে ঢুকে যেতে পারে। যে জিনিসে কারও এলার্জি সেটা খেলে কিংবা শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে যদি ভেতরে ঢোকে তবে হাঁপানি হতে পারে। হাঁপানি কোনও ছোঁয়াচে রোগ নয়। সাধারণত শীতকালে হাঁপানি বাড়ে এবং রাত্রি বেলাতেই এটি বেশি হয়। অনেকের সারাটা জীবনই হাঁপানির সমস্যা থেকে যায়। হাঁপানি হলে রোগী বাতাস থেকে যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে না। ফলে রোগীর নখ ও ঠোঁট নীল হয়ে যায় এবং শিরা ফুলে ওঠে।

হাঁপানি হলে রোগীর জ্বর থাকে না কিন্তু কাশির সঙ্গে কিছু সাদা কফ থাকে।

হাঁপানির চিকিৎসা

১। কারও যদি ঘরের ভেতরে হাঁপানি বেড়ে যায়, তবে যেখানে মুক্ত এবং পরিষ্কার বাতাস আছে সেখানে রোগীকে নিয়ে যেতে হবে।

২। রোগীকে প্রচুর তরল জিনিস খেতে দিতে হবে এতে শ্লেষ্মা পাতলা হবে। এবং গরম পানির ভাপ নিতে হবে।

৩। রোগীকে মানসিক ভাবে আশ্বাস প্রদান করতে হবে।

৪। হাঁপানি হলে রোগীকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া যাবে না।

৫। রোগীর অবস্থা ভাল না হলে অবিলম্বে ডাক্তারী চিকিৎসা নিতে হবে।

ঘরোয়া প্রতিকার

১। যে সব জিনিস খেলে হাঁপানি বাড়ে ঐ ধরনের জিনিস খাওয়া উচিত নয়।

২। বাড়ির আশে পাশে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

www.banglainternet.com

৩। রোগীর বিছানাপত্র সব সময় রোদে দিতে হবে।

৪। হাঁস, মুরগী, বিড়াল কুকুর কিংবা কোনও লোমওয়ালা প্রাণী যেগুলো থেকে হাঁপানির সৃষ্টি হয় সেসব প্রাণী থেকে দূরে থাকতে হবে।

কাশি

কাশি কোনও নির্দিষ্ট রোগ নয়, গলা, ফুসফুস কিংবা শ্বাসনালীতে কোনও সংক্রমণ হলে কাশি হয়।

বিভিন্ন ধরনের কাশি মানুষের হয়ে থাকে। যেমন– কফ সহ কাশি। ব্রঙ্কাইটিস নিউমোনিয়া হলে কাশির সাথে কফ থাকে। আবার কিছু কিছু কাশি আছে সেসব কাশি শুকনো। কাশির সাথে কোনও কফ থাকে না। সাধারণত ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর হলে এ ধরনের কাশি হয় আবার যারা ধূমপান করেন এদেরও এরকম কফবিহীন খুশখুশে কাশি হয়। আবার আরেক ধরনের কাশি আছে যে কাশির সাথে সাঁই সাঁই বা ঘড় ঘড় টান আর শ্বাসকষ্ট হয়। সাধারণত হাঁপানি হলে, ডিপথেরিয়া হলে কিংবা হার্টের রোগ থাকলে এ ধরনের কাশি হয়।

কিভাবে কাশির প্রাথমিক চিকিৎসা করবেন

১। কাশি হলে কফ যাতে পাতলা হয়ে যায় এজন্য প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে।

২। গরম পানির ভাপে শ্বাস নিতে হবে। ভাপ নেবার পদ্ধতি হলো– একটি চেয়ারে বসে পায়ের কাছে এক বালতি গরম পানি রাখতে হবে । মাথার ওপরে একটি তোয়ালে দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পরে বালতি থেকে যে ভাপ উঠবে সেই ভাপটা গভীরভাবে নাক দিয়ে টেনে নিতে হবে। এইভাবে ১৫ মিনিট ধরে শ্বাস নিতে হবে। অথবা বেসিনের মধ্যে গরম পানি নিয়ে বেসিনের মুখ বন্ধ করেও এটি করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় শ্লেষ্মা আলগা হয়ে যায়।

৩। রোগীর যদি শুকনো কাশি হয় এবং ঘুমোতে অসুবিধা হয় তবে ডাক্তারের পরামর্শ মতো ওষুধ খেতে হবে।

৪। ধূমপান করা যাবে না। ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

৫। যে রোগের জন্য কাশি হচ্ছে তার কারণটা খুঁজে বের করতে হবে।

৬। কফ যদি খুব বেশি হয় তবে রোগীকে প্রথমে গরম পানির ভাপ নিতে বলতে হবে। এরপর রোগীকে উপুড় করে শুইয়ে দিতে হবে যেন মাথা ও বুক খাটের কিনারার বাইরে ঝুলে থাকে। এরপর পিঠের মধ্যে চাপড় দিতে হবে। এতে কফ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে।

www.banglainternet.com

নিউমোনিয়া

নিউমোনিয়া ফুসফুসের একটি তীব্র সংক্রমণ। সাধারণত ছোট শিশুদের নিউমোনিয়া বেশি দেখা যায়। এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। নিউমোনিয়া হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৃত্যুও ঘটতে পারে। ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি কিংবা ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে অনেক সময় নিউমোনিয়া হয়ে যায়।

নিউমোনিয়ার লক্ষণ বোঝার উপায়

১। খুব কাশি হয়, কাশির সাথে সাঁই সাঁই করে শব্দ হয়, শ্বাস প্রশ্বাস খুব দ্রুত হয়।

২। কাশি হলে কফের রঙ হয় হলুদ, সবুজ কিংবা রক্তের মতো লাল।

৩। রোগীর জ্বর খুব বেশি থাকে এবং রোগীকে খুবই অসুস্থ দেখায়।

৪। রোগী যখন শ্বাস প্রশ্বাস নেয় বা কাশি দেয় তখন রোগীর বুকে ব্যথা হয়।

৫। রোগী শ্বাস নেবার সময় নাকের ফুটো বড় হয়ে যায়। প্রতি মিনিটে যদি ৫০ বারের বেশি হালকা শ্বাস নেয় তবে হয়তো বোঝা যাবে যে তার নিউমোনিয়া হয়েছে।

প্রাথমিক চিকিৎসা

১। রোগীকে প্রচুর তরল খাবার দিতে হবে। রোগী যদি খেতে অপারগ হয় তবে তরল জিনিস বা চিনি-লবণের সরবত দিতে হবে।

২। জ্বর এবং ব্যথা কমানোর জন্য প্যারাসিটামল দিতে হবে।

৩। রোগীকে গরম পানির ভাপ নিতে বলতে হবে। এতে রোগীর কাশি কমবে এবং কফও পাতলা হবে। উপুড় করে শুইয়েও কফ বের করা যাবে।

৪। চিকিৎসকের পরামর্শ মতো অতিদ্রুত এন্টিবায়োটিকের ব্যবস্থা করতে হবে।

ব্রঙ্কাইটিস

আমাদের শরীরে যে সব নল দিয়ে ফুসফুসে বাতাস ঢোকে, তাদের সংক্রমণকে ব্রঙ্কাইটিস বলে। ব্রঙ্কাইটিস রোগটি সাধারণত ভাইরাস থেকে হয়। ব্রঙ্কাইটিস

www.banglainternet.com

হলে রোগী খুব শব্দ করে কাশতে থাকে। ব্রঙ্কাইটিসের স্থায়িত্ব এক সপ্তাহের বেশি দিন ধরে চললে নিউমোনিয়া হয়ে যেতে পারে। তাই সহসাই চিকিৎসা করা উচিত। তুষার বর্ষিত এবং ধূলিময় পরিবেশ ও আবহাওয়ায় ব্রঙ্কাইটিস হতে পারে। ব্রঙ্কাইটিস দু'ধরনের। একটি তীব্র অন্যটি দীর্ঘস্থায়ী।

ব্রঙ্কাইটিসের লক্ষণ বোঝার উপায়

১। ব্রঙ্কাইটিস দীর্ঘদিন ধরে চলে। কাশির সাথে কফ থাকে। কাশির সাথে জ্বর থাকে এবং তা ১০৩° পর্যন্ত ওঠে।

২। এই কাশি ঘুরে ঘুরে প্রতি বছরই হয়। বছরের অন্তত ৩ মাস এ কাশি হতে পারে। রোগীর যদি হাঁপানি কিংবা যক্ষা না থাকে তবে বুঝতে হবে যে পুরনো ব্রঙ্কাইটিস।

৩। ধূমপান যারা করেন এদের এ রোগ হয়ে থাকে।

৪। ব্রঙ্কাইটিস যদি খুব পুরনো হয়ে যায় তবে রোগীর শ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হয়।

৫। বুকের ওপর গভীর ব্যথা অনুভব করে এবং দম নিতে কষ্ট হয়। শ্বাস ফেলার সময় গলায় শব্দ হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা

১। ধূমপান বন্ধ করতে হবে।

২। রোগীর যদি পুরনো ব্রঙ্কাইটিস থাকে, যদি তার সাধারণ সর্দি জ্বরও হয়ে থাকে তবে তাকে এন্টিবায়োটিক খেতে হবে।

৩। কাশির সাথে কফ থাকলে গরম পানির ভাপ নিতে হবে এবং বিশেষভাবে শুইয়ে কফ বের করতে হবে।

৪। প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে।

৫। রোগীকে পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হবে।

খুব বেশি জ্বর হলে

যখন মানুষের শরীরের তাপ খুব বেশি হয় তখনই আমরা তাকে জ্বর বলে থাকি। জ্বর নিজে কোনও রোগ নয় তবে অনেকগুলো রোগের লক্ষণ। জ্বর যদি খুব বেশি হয় তবে বিপদ ঘটতে পারে।

www.banglainternet.com

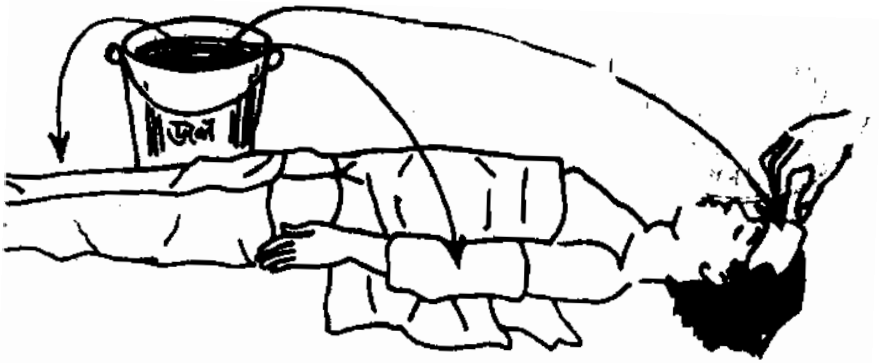

বেশি জ্বর হলে করণীয়

১। গায়ের জামা কাপড় সব খুলে ফেলতে হবে।

২। রোগীকে স্পঞ্জ করতে হবে।

৩। স্পঞ্জ করতে হলে ঈষদুষ্ণ পানি নিতে হবে। এরপর একটি পরিষ্কার কাপড় পানিতে ভিজিয়ে প্রথমে হাত পরে পা এবং শেষে সমস্ত শরীর মুছে দিতে হবে। এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত জ্বর না কমবে ততক্ষণ পর্যন্ত শরীর মুছে যেতে হবে। শরীর মোছার পর পরই শুকনো তোয়ালে দিয়ে পানি মুছে ফেলতে হবে। স্পঞ্জ করার সময় মনে রাখতে হবে যেন রোগীর ঠাণ্ডা লেগে না যায়। মাথার ওপর একটু জায়গা জুড়ে বরফের ব্যাগ দিতে হবে। এতে রক্তবাহী শিরাগুলো সংকুচিত হয়।

৪। জ্বর হলে শরীরের ক্ষমতা অনেকাংশে কমে যায় তাই প্রয়োজন হলে স্যালাইন খেতে দেওয়া উচিত।

৫। প্রয়োজন অনুযায়ী প্যারাসিটামল খেতে দিতে হবে।

www.banglainternet.com

Goto List >

অষ্টাদশ অধ্যায়

পেটের বিভিন্ন রোগ চিকিৎসা ও করণীয়

সাধারণত পেটের বেশির ভাগ সমস্যার কারণ হচ্ছে বেঠিক খাবার, অনিয়মিত ও অপরিমিত খাদ্য গ্রহণ, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে উদাসীনতা, যথেচ্ছাচার ইত্যাদি। অথচ একটু যত্ন নিলেই এবং একটু নিয়ম মেনে চললেই পেটের কিছু কিছু সমস্যার আনেকাংশে সমাধান সম্ভব।

কিন্তু এত কিছুর পরেও কিছু কিছু সমস্যা আছে যা আমাদের দেহকে ক্লান্ত, দুর্বল ও অসুস্থ করে তোলে। দৈনন্দিন জীবনে নিয়ম মেনে চলার পরেও আমাদের শরীর আমাদের সাথে প্রতারণা করে থাকে। প্রথমে সামান্যভাবে হলেও যত্ন ও সঠিক চিকিৎসার অভাবে পরবর্তীতে তা জটিল আকার ধারণ করে থাকে। সেই ধরনের কিছু সমস্যা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

বদহজম

বদহজমকে বলা চলে শারীরিক বিপত্তির এক ধরনের সংকেত। বদহজম নানারকম রোগের উপসর্গ। এটি বিশেষ কোনও রোগ নয়। যদি এমন দেখা যায় যে কারও বদহজম লেগেই আছে তবে বুঝতে হবে তার কোনও রকম শারীরিক বিপর্যয় আছে। বদহজম যদি হয় তবে নানা ধরনের রোগ দেখা দেয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, বদহজম শুনলেই ডাক্তাররা গল ব্লাডারের কিংবা লিভারের সমস্যা ধরে থাকেন। এবং অনেক ক্ষেত্রেই ডাক্তারের ধারণা ঠিক হয়। বদহজমের সাথে আরও অন্যান্য যে সব সমস্যা দেখা দেয় তা হলো– খেলেই পেটে গ্যাস হয়, পেট ফেপে ওঠে, পায়খানা পরিষ্কার হয় না ইত্যাদি।

বদহজমের কারণ হলো, লিভার থেকে যে এনজাইমগুলো আসে সেগুলো যদি লিভারের দুর্বলতার কারণে খাদ্যসামগ্রী হজম করাতে না পারে তাহলেই বদহজম হয়। যারা কায়িক পরিশ্রম বেশি করেন তাদের সাধারণত বদহজম হয় না। যারা পরিশ্রম করতে চান না তারাই বেশি বদহজমে আক্রান্ত হন। যারা উপর্যুপরি ভোজন করেন, রাত জাগেন কিংবা মদ্যপান করেন এরাই বদহজমে

www.banglainternet.com

আক্রান্ত হন বেশি। এছাড়াও ঘুমের ব্যাঘাত হলে, ব্লাড সুগার বাড়লে, দুশ্চিন্তা কিংবা লিভারের কোনও বড় অসুখ থাকলে বদহজম হয়ে থাকে। বদহজমের উপসর্গ হলো টক ঢেঁকুর, বমি-বমি ভাব, পায়খানার সঙ্গে গোটা গোটা সামগ্রী পড়া, বুক গলা জ্বালা করা, মাথার যন্ত্রণা এবং পেট ফাঁপা। বদহজম হলে শাক সব্জি সেদ্ধ করে খাওয়ালে, বিশেষ করে দাঁত ওঠার বয়সটাতে একটু নজর দিলে ব্যাপারটা এড়ানো যায়। বৃদ্ধ মানুষরাও কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগতে পারে। তাদের খাওয়া দাওয়া এবং বিশ্রামের প্রতি একটু যত্ন নিলেই এ সমস্যা থাকবে না।

লিভারের অসুখ

অনেক সময়ে অনেক ভাইরাসের কারণে হঠাৎ করেই লিভার অসুস্থ হয়ে পড়ে। অনেক সময় দীর্ঘদিনের অনিয়মে এবং ক্ষতিকর খাদ্য পানীয়ের প্রভাবে লিভার ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে। হেপাটাইটিস হলে পেট ব্যথা, বমি ভাব, অরুচি, ক্ষুধাহীনতা, জন্ডিস ইত্যাদি দেখা যায়। এ সময় পুরোপুরি বেড রেস্ট দরকার। কেউ যদি এ্যালকোহল সেবন করে থাকেন তবে তা বন্ধ করতে হবে।

লিভারের সাথে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের সম্পর্ক

লিভার খারাপ হলে ত্বকের ওপর এর প্রভাব পড়ে। লিভার খারাপ হলে ত্বকের রঙ পরিবর্তন হয়। জন্ডিস হলে ত্বক হলদেটে হয়ে পড়ে।

পিগমেন্টেশন

লিভার খারাপ হলে মুখে ছিট ছিট দাগ হতে পারে। যাকে আমরা মেচতা বলি। শরীরে হরমোনের স্বাভাবিক ক্ষরণের তারতম্য ঘটলে (জন্মনিরোধক ওষুধ সেবন বা শারীরিক ব্যধি থেকে যা হতে পারে) লিভারে অনেক সময়ই তার প্রভাব পড়ে। এর ফলে শরীরে কালো ছোপ ছোপ দাগ হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে কালো ছোপ ছাড়া সাদা দাগও হতে পারে।

চুলকানি

লিভার যদি কোনও কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে সমস্ত শরীরে চুলকানি হতে পারে। যেমন জন্ডিস হওয়ার আগে এবং জণ্ডিস চলাকালীন সময়ে অসম্ভব চুলকানি হয়। এই চুলকানি অন্য অসুখেও হয়ে থাকে। তবে লিভার স্বাভাবিক না থাকলেই এ রকম হয়ে থাকে।

www.banglainternet.com

এলার্জি

হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের আক্রমণের ফলে লিভার অনেক সময় অকেজো হয়ে পড়ে। এই রোগের প্রকোপ হলে মুখে, হাতে ও শরীরের অন্যান্য অংশে নানা ধরনের গুটি দেখা যায়। একে আমরা আমবাত বলে থাকি।

শিরার স্ফীতি

অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে মুখের ত্বকে মাকড়সার মতো দেখতে লাল লাল ছোপ পড়ে। হাত লাল হয়ে ওঠে। এর কারণ ত্বকের নিচে রক্তবাহী শিরাগুলো স্ফীত হয়ে রক্তক্ষরণ হয় অথবা রক্ত জমে যায়।

নখ

লিভার খারাপ হলে নখও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যেমন নখ ভেঙ্গে গিয়ে সাদা সাদা দাগ হওয়া ইত্যাদি লিভার খারাপেরই লক্ষণ।

হরমোন

সব সময় লিভারের সমস্যায় ভুগলে হরমোনের গণ্ডগোল হয়ে থাকে। লিভার খারাপ হওয়ার কারণে হরমোনের স্বাভাবিক গতি প্রকৃতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। এতে করে ইস্ট্রোজেন হরমোন বেড়ে যেতে পারে। ফলে পুরুষের চুল পড়ে যায়। পৌরষহীনতা দেখা দেয়, যৌনতায় অনাসক্তি, স্তনের স্ফীতি ইত্যাদি রোগও দেখা দেয়। এভাবে লিভার খারাপ হলে ত্বকে এর প্রভাব পড়ে। আবার ত্বক খারাপ হলেও লিভারে এর প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে। লিভারের সমস্যা থাকলে মুখেও দুর্গন্ধ হয়।

যাদের লিভারের সমস্যা আছে

যাদের লিভারের সমস্যা আছে তারা তো বটেই, আবার যাদের লিভারের সমস্যা নেই তাদেরও প্রতিদিন খাওয়া দাওয়া ও নিত্যদিনের অভ্যাসের দিকে নজর দিতে হবে, তবেই আপনার লিভার থাকবে সুস্থ ও কার্যক্ষম।

১। যাদের লিভার খারাপ তারা প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে এক টেবিল চামচ করলার রস খাবেন। আবার যাদের লিভার ভাল তারা ছোট চামচের এক চামচ রস খেলেই ভাল থাকবেন।

www.banglainternet.com

২। ভাজাভুজি যত কম খাওয়া যায় ততই ভাল।

৩। অতিরিক্ত তেল, ঘি, মাখন কোনও অবস্থাতেই খাওয়া যাবে না।

৪। যে কোনও একটি শাকের রস (যেমন পালংশাক) খেতে পারলে ভাল। আর যদি শুধু রস খাওয়া না যায় তবে ফলের দু'একটা টুকরো কেটে তাতে দেওয়া যায়।

৫। দুধ না খাওয়াই ভাল। আর দুধ খেতে চাইলেও ওপরের সরটা তুলে ফেলে তারপর খেতে হবে।

৬। প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে।

৭। শুধু খাবার নিয়ে ভাবলেই হবে না। কিভাবে রান্না হচ্ছে সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে।

৮। নিয়মিত ভাবে খাদ্য গ্রহণের সাথে সাথে পর্যাপ্ত ব্যায়ামও করতে হবে। যারা খুব একটা শারীরিক পরিশ্রম করেন না তাঁদের জন্য ব্যায়াম অত্যাবশ্যক।

শিশুদের ব্যাপারে সর্তকতা

শিশুদের খাবার দাবারের ব্যাপারে আমরা কড়াকড়ি করে থাকি– যখন শিশু নিতান্ত শিশু থাকে। এরপর যখন একটু বড় হয় তখন কড়াকড়ি শিথিল হয়ে যায়। প্রায়ই এমন দৃশ্য দেখা যায় যে, মা বাবা শিশুর মুখে রাস্তার খাবার তুলে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। এটি ঠিক নয়, আবার অনেকে আছেন শিশুদের ফোটানো পানি খাওয়ান ঠিকই কিন্তু পানি ফোটানোর সঠিক নিয়ম তারা মেনে চলেন না। পানি ঠিক আধ ঘণ্টা ধরে ফোটাতে হবে তারপর সেই ফোটানো পানি শিশুকে খাওয়াতে হবে। এছাড়াও শিশুদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় শিশুরা পঁচা, বাসি এবং আঢাকা খাবার খেয়ে ফেলে। তাই এ ধরনের খাবার যাতে শিশুরা না খেতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। আবার এমনও দেখা যায় অত্যন্ত ছোট শিশু মাটিতে খেলাধূলা করতে করতে মুখে হাত দিয়ে দেয় এতে করে শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে।

আলসার

পেটের যে বিভিন্ন রোগ রয়েছে এর মধ্যে আলসার একটি বড় রোগ। আলসার একদিনে হয় না আবার হঠাৎ করে কোনও সমস্যাও দেখা দেয় না। বিভিন্ন কারণে পেটের ভেতরে যদি কোনও সমস্যা থাকে, তবে তা ধীরে ধীরে আলসারের দিকে এগিয়ে যায়। আলসার হলে প্রথম প্রথম বদহজম হয়, বুক জ্বালা করে এবং টক ঢেঁকুর ওঠে। এ ধরনের উপসর্গ অতি সাধারণ এবং এত

www.banglainternet.com

মানুষের মধ্যে এ ধরনের উপসর্গ রয়েছে যে, ব্যাপারটাকে আমরা তেমন গুরুত্ব দেই না। এ ধরনের সমস্যা হলেই আমরা এন্টাসিড খেয়ে নেই। এভাবে এন্টাসিড খাওয়াটা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এরপর আমরা যখন দেখি আমাদের রোগ ভাল হচ্ছে না তখনই আমরা ডাক্তারের কাছে ছুটে যাই।

আলসারের কারণ

আমাদের পাকস্থলী কিংবা স্টমাকে যদি কোনও ভাবে এসিড বেশি উৎপন্ন হয় তাহলেই আলসার দেখা দেয়। অনেক সময় গলব্লাডারে পাথর হওয়ার জন্যও এ রকম হয়ে থকে। প্রতিটি মানুষের পাকস্থলীতে কিছু ব্যাকটেরিয়া থাকে। অনেক সময় এই ব্যাকটেরিয়া থেকে আলসার হয়। আবার খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম কিংবা অতিরিক্ত টেনশন থেকেও আলসার হয়ে থাকে।

আলসারের লক্ষণ

১। গলা, বুক ও পেট জ্বালা করে।
২। ওপরের পেটের মাঝখানে কিংবা সামান্য ডান দিকে ব্যথা হয়।
৩। পেট যখন খালি থাকে তখনই ব্যথা বাড়ে।
৪। কিছু খেলে কিংবা যখন এন্টাসিড খাওয়া হয় তখন জ্বালা কমে যায়।
৫। অনেক সময় রক্ত বমি বা কালো পায়খানা হতে পারে।

আলসারের প্রকারভেদ

আলসার সাধারণত দু'রকমের হয়ে থাকে। পেটের যে কোনও আলসারকেই ডাক্তারি পরিভাষায় পেপটিক আলসার বলা হয়ে থকে। পেপটিক আলসারের দুটো ভাগ রয়েছে। এর একটি হচ্ছে ডিয়োডিনাল আলসার। এই আলসার পাকস্থলীতে হয় না এবং এটি অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর। এ আলসারের থেকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই থাকে না।

গ্যাস্ট্রিক আলসার

এই আলসার পাকস্থলীর মধ্যে হয় এবং এই আলসার হলে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা দেখা দেয়। এই আলসার হলে রক্ত বমি হয় এবং শরীরের ওজন কমে যায়। ক্ষুধা কমে যায় এবং ওপরের পেটে ব্যথা থাকে। এভাবে কোনও না কোনও কষ্ট লেগেই থাকে। ঠিক সময়ে যদি এ আলসারের চিকিৎসা না হয় তবে এর থেকে ক্যান্সারও হয়ে যেতে পারে।

www.banglainternet.com

আলসার হলে করণীয়

১। নিয়মিত ভাবে এবং ঠিক সময়মত খাওয়া দাওয়া করতে হবে।

২। যদি মনে করে থাকেন যে, আলসার হয়েছে তবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। নিয়মিত ও সময়মত ঘুমোতে হবে। দুঃশ্চিন্তা পরিহার করতে হবে।

৪। আস্তে আস্তে চিবিয়ে খাবার গ্রহণ করতে হবে। চিবানো একটি অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য হজমের কাজের অংশবিশেষ। মুখের লালায় যে এনজাইম আছে তা খাদ্যকে সহজপাচ্য করে এবং পাকস্থলীর হজম শক্তিকে সহায়তা করে।

কি করা উচিত নয়

১। অকারণ টেনশন পরিহার করুন।

৩। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাবেন না।

৪। কোনও অবস্থাতেই মদ্যপান করবেন না।

৫। ধূমপান বন্ধ করুন।

৬। অনুসন্ধান করুন কোন্ কোন্ খাদ্য আপনার পাকস্থলীকে অশান্ত করে। এবং যথাসম্ভব তা এড়িয়ে চলুন।

৭। হালকা মশলাযুক্ত খাবার আলসারের রোগী খাবেন। যে সকল খাবার সহজপাচ্য এবং ঝালবিহীন তরল খাবার খাবেন।

৮। অতিরিক্ত ঝাল, টক এবং মশলাযুক্ত খাবার বর্জন করুন।

৯। চটপটি, ফুচকা ইত্যাদি খাবার খেলে আলসার তো হতেই পারে সেই সাথে জণ্ডিস এবং টাইফয়েডও হতে পারে।

অন্যান্য কিছু নিয়ম

জীবনযাত্রাকে নিয়মমাফিক করা উচিত, গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়মমাফিক বলে তাদের এ ধরনের রোগ কম হয়। পক্ষান্তরে শহরের জীবন টেনশনের এবং প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ওষুধ সেবনের কারণেও এ ধরনের রোগ হয়ে জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলছে। এজন্য কিভাবে মনোদৈহিক রিলাক্সড অনুভব করবেন তা শিখে নিয়ে মানসিক চাপ কমাবেন। নিয়মিত ব্যায়ামের চেষ্টা করুন কিন্তু কোনও কষ্টসাধ্য কাজ করবেন না যা আপনি সহ্য করতে পারেন না। মৃদু ব্যায়াম আপনাকে সাহায্য করবে মানসিক ও শারীরিক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে।

www.banglainternet.com

কোষ্ঠকাঠিন্য

আমাদের দেহের বিশেষ করে পেটের নানাবিধ অসুখের জন্যই কোষ্ঠকাঠিন্য হয়ে থাকে। যেমন– খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম, ভেজাল খাদ্য গ্রহণ এবং খাওয়া দাওয়ার অভ্যাস পরিবর্তনের ফলেই রোগটি হয়ে থাকে। মানুষের ভেতর উদ্বেগ টেনশন বেড়ে যাওয়াতে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। কারণ মানুষ যখন অতিমাত্রায় টেনশন করে তখন মানুষের মধ্যে হজমের গোলযোগ দেখা দেয়। এতে করে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রোগ বাসা বাঁধে। এ ধরনের অনেকগুলো অসুখ বিসুখের মধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্যও একটি রোগ। কোষ্ঠকাঠিন্য হলে হজমের গন্ডগোল ঘটে। পুরনো দিনের লোকেরা নিয়ম কানুন মেনে চলতো, যেমন– নিয়ম করে শুয়ে পড়া, ভোরে ঘুম থেকে ওঠা, শারীরিক শক্তি ব্যয় করা, শারীরিক শক্তি ব্যয় হয় এমন কাজ করা। বর্তমানে এসব অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। অনেকেই রাত জেগে কাজকর্ম করে থাকেন এবং অনেক বেলা করে ঘুম থেকে উঠে থাকেন। কায়িক পরিশ্রমের চাইতে এখন মানসিক পরিশ্রমই বেশি করে থাকেন। আবার শিশুদের ক্ষেত্রে কোষ্ঠকাঠিন্যের আরেকটা কারণ হচ্ছে কৌটোর দুধ। যেসব মা শিশুদের স্তন্যপানের পরিবর্তে কৌটোর দুধ পান করিয়ে থাকেন এসব শিশুদেরও কোষ্ঠকাঠিন্য হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন দেখে শিশুদের যে কোনও জিনিস খেতে দেওয়া উচিত নয়। বাসি খাবার খেতে দেওয়াও উচিত নয়। শিশুদের পেট ঠিক রাখতে হলে মাঝে মধ্যে কাঁচা কলা ও কাঁচা পেঁপে সেদ্ধ করে খাওয়ানো উচিত। শিশুদের পেটে যদি সামান্য গন্ডগোল দেখা দেয় তবে সাথে সাথে ওষুধ খাওয়ানো ঠিক নয়। অনেক সময় বদহজম থেকে পেট খারাপ হয়ে থাকে। আবার আপনা আপনিই সেরে যায়। তবে ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হলে অতি সত্বর ডাক্তার দেখাতে হবে। ঘন ঘন এন্টাসিড খাওয়া ঠিক নয়। এন্টাসিডের অনেক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে যা শরীরের ক্ষতি করে থাকে।

ডায়রিয়া

অন্যান্য অনুন্নত দেশের মতো বাংলাদেশেও ডায়রিয়া একটি ব্যাপক স্বাস্থ্য সংকট সৃষ্টি করেছে। সাধারণত প্রতি বছর মার্চ থেকে আরম্ভ করে মে মাস পর্যন্ত এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, অবশ্য বছরের অন্য সময়টাতেও এ রোগ হয়ে থাকে। সব বয়সী লোকদেরই ডায়রিয়া হতে পারে। তবে শিশুদের মধ্যে এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক জরিপে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের শতকরা ৩০ ভাগ শিশু ডায়রিয়া ও তৎজনিত অপুষ্টির কারণে মারা যায়। প্রতি বছর প্রায় আড়াই লাখ শিশু এভাবে মারা যায়।

www.banglainternet.com

ডায়রিয়া কি

২৪ ঘণ্টায় তিন বা ততোধিকবার পাতলা পায়খানা হয়ে শরীরে পানিশূন্যতা সৃষ্টি করলে তাকে ডায়রিয়া বলে। ডায়রিয়া হলে কখনও ঘন ঘন পাতলা পায়খানার সাথে বমি আরম্ভ হয়। এতে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। শিশুদের খাওয়ার প্রতি অনীহা দেখা দেয়। শরীরের ওজন কমে যায়, মায়ের দুধ যে সব শিশুরা খায় তারা দুধ খাওয়া ছেড়ে দেয়। পায়খানার পরিমাণ বেড়ে গিয়ে সবুজ ও হলুদ রঙের হয়। ডায়রিয়া শুরু হলে কিছুক্ষণ সময়ের মধ্যেই শিশুর শরীরে ব্যাপক পানিশূন্যতার লক্ষণ দেখা দেয়। শিশুর চোখ গর্তে ঢুকে পড়ে। মাথার সামনের দিক ভেতরের দিকে বসে যায়। নাড়ীর গতি দুর্বল হয়ে পড়ে। পেটের আকৃতি চৌকণা হয়ে যায়। হাত, পা, ঠোঁট, নাক, কান ইত্যাদি ঠাণ্ডা হয়ে আসে। সমস্ত শরীর নীলাভ হয়ে আসে। সমস্ত শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে আসে।

ডায়রিয়ার প্রকারভেদ

সাধারণত দু'ধরনের ডায়রিয়া দেখা যায়।

একুইট ডায়রিয়া– যা স্বল্প সময়ে দেখা যায়। ক্রনিক ডায়রিয়া– অনেকদিন ধরে ডায়রিয়া চলতে থাকে।

যে কারণগুলোর ফলে ডায়রিয়া হয় সেগুলো হলো– বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়াল ইনফেক্শন, এলার্জি, খাদ্যে বিষক্রিয়া, দুধের এলার্জি ইত্যাদি আরও নানাধরনের কারণ।

ডায়রিয়ার প্রতিকার

ওরাল রিহাইড্রেশন– ডায়রিয়া জনিত রোগসমূহ মোকাবেলায় সিংহভাগ ভূমিকা রাখে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই ওরাল রিহাইড্রেশন পদ্ধতি যদি গ্রহণ করা হয় তবে মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস পাবে।

রিহাইড্রেশন থেরাপী

বাড়িতে তৈরি ও.আর.এস বা খাবার স্যালাইন ডায়রিয়ার কারণে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া সমূহকে ম্যানেজ করে। নব্বই শতাংশ ডায়রিয়ার রোগী এই খাবার স্যালাইন দ্বারা ম্যানেজ করা যায়। এই স্যালাইন বানানোর পদ্ধতি হচ্ছে এক চিমটি লবণ এবং এক মুঠো গুঁড় আধা লিটার পানিতে মিশিয়ে তৈরি করতে হবে। এছাড়াও

www.banglainternet.com

বুকের দুধ, সাদা পানি, ডাবের পানি, চিড়ার পানি, লবণ-চিনির মিশ্রণ, হালকা চা, স্যুপ ইত্যাদি বাড়িতে খাবার স্যালাইন হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে একটি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এই পানিশূন্যতা যদি দূর না হয়, তবে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ওরাল স্যালাইন এনে খাওয়াতে হবে। খাবার স্যালাইন খেলে রোগী যদি একবার বমি শুরু করে তবে তা সহজে থামানো যাবে না। রোগীকে চারভাগের এক ভাগ খাবার স্যালাইন খেতে দিতে হবে প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর। রোগীকে স্বাভাবিক সব খাবার দেওয়া যাবে। স্যালাইন বানানোর বারো ঘণ্টার মধ্যেই এই স্যালাইন খাওয়ানো যাবে।

চালের তৈরি খাবার স্যালাইন

এই স্যালাইনে শুধুমাত্র পানিশূন্যতা দূর হয় না– এটি পুষ্টিও যোগায়। এটি বানাতে খরচও কম পড়ে। চালের তৈরি খাবার স্যালাইন, গ্লুকোজের তৈরি খাবার স্যালাইন থেকে উন্নতর। এটি শিশুর জীবন বাঁচাতে অত্যন্ত কার্যকর। এই স্যালাইন ৫ মাস এবং তার নিচের বয়সের শিশুদের জন্য অনুপযোগী।

রোগী যদি শক্ প্রাপ্ত হয়

যে সমস্ত রোগী পাতলা পায়খানার কারণে অজ্ঞান হয়ে বা খুব বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে এদের শিরার মধ্যে স্যালাইন দিতে হবে। পরবর্তীতে রোগীর অবস্থার ওপর নির্ভর করে খাবার স্যালাইন দিতে হবে। ডায়রিয়া যদি আপনা আপনি বন্ধ না হয় তবে রোগীকে ওষুধ দিতে হবে।

শিশুকে কখন হাসপাতালে বা চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করবেন

১। যদি আমাশয় হয় (পায়খানায় রক্ত থাকলে)।

২। তীব্র পানিশূন্যতা হলে।

৩। তীব্র বমি হলে যখন শিশু কিছু খেতে পারে না এবং ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

৪। শিশুর খিঁচুনী দেখা দিলে।

৫। শিশুর প্রস্রাব ১২ ঘণ্টা কিংবা তারও বেশি সময় ধরে বন্ধ থাকলে।

৬। তিন দিন ধরে স্যালাইন খাওয়ানোর পরও যদি ডায়রিয়া ভাল না হয়।

www.banglainternet.com

বিলম্ব হলে

শিশুর অপুষ্টি দেখা দিলে ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে। শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে বিভিন্ন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়। শরীরে বিভিন্ন ভিটামিনের অভাব পড়ে। বিশেষ করে ভিটামিন 'এ'-র অভাবে রাতকানা রোগ হয়। অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং বৃক্কের ক্রিয়া বন্ধ হয়েও শিশু মারা যায়। তাই ডায়রিয়া সেরে গেলেও শিশুকে অধিক পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার বেশি বেশি করে খাওয়াতে হবে।

ডায়রিয়া প্রতিরোধ

১। খাওয়া, ধোয়া এবং রান্নার কাজে নলকূপের বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতে হবে।

২। পায়খানা থেকে আসার পর এবং খাওয়ার পূর্বে হাত ভালভাবে সাবান কিংবা ছাই দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।

৩। নখে যাতে ময়লা না জমে সেজন্য নিয়মিত নখ কাটতে হবে।

৪। বাসি, পঁচা বা ফেলে দেওয়া খাবার কখনওই খাবেন না। খাবারে যেন মশা-মাছি না বসে সেজন্য খাবার ঢেকে রাখতে হবে।

৫। ডায়রিয়া রোগীর পায়খানা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

৬। বিশুদ্ধ নলকূপের পানি ব্যবহার করতে হবে। ফুটানো পানি পান করতে হবে।

৭। শিশুকে বুকের দুধ দিতে হবে এবং বুকের দুধ দেবার পূর্বে স্তন বোঁটাসহ পরিষ্কার করতে হবে।

৮। শিশুকে সঠিকভাবে বুকের দুধ খাওয়ানো এবং সময়মত বাড়তি খাবার দিলে ডায়রিয়া কম হয়।

বাড়িতে নিরাপদ খাবার তৈরি করবেন কিভাবে

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ব্যাপকভাবে রোগ সংক্রমণ হয় মাত্র কয়েকটি কারণে। এজন্য দায়ী সাধারণ ভুলগুলোর সহজে সমাধান করা যায় কিছু নিয়ম মেনে চললে।

১। শিশুর খাবার যারা তৈরি করেন, তাদেরকে খাবার তৈরির আগে পরিষ্কার পানিতে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

২। মলত্যাগের পর বাড়ির সকলকে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।

www.banglainternet.com

৩। শিশুর মল পরিষ্কার করার পরও সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।

৪। খাওয়ার পূর্বে, খাবার পরিবেশনের পূর্বে কিংবা খাবারে হাত দেওয়ার পূর্বে ভাল করে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

৫। হাতে যদি কারও ঘা থাকে তবে ঐ হাত দিয়ে খাবার তৈরি কিংবা পরিবেশন করলে রোগ ছড়াতে পারে।

৬। রান্নার পর পরই খাবার খেয়ে নেওয়া ভাল। কারণ রান্নার পরে সময় যত বাড়তে থাকে রোগ সংক্রমণ ততো বাড়তে পারে।

৭। খাবার সব সময় ঢেকে রাখতে হবে যাতে রোগ সংক্রমণ না ঘটে।

৮। মাছি, পোকামাকড়, ইঁদুর বা অন্যপ্রাণী যাতে খাবার দূষণ করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

৯। ভালভাবে রান্না করে খাবার খেতে হবে। ফল বা সালাদের উপকরণগুলো খাবার আগে বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।

১০। রান্না করা এবং কাঁচা খাবার একত্রে রাখা যাবে না।

১১। রান্না করা খাবার যদি দু'ঘণ্টার বেশি এমনি পড়ে থাকে, তবে খাবার পূর্বে পুনরায় ফুটিয়ে নিতে হবে।

১২। রান্না ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে। খাদ্য তৈরি ও পরিবেশনের জন্য যে সকল হাঁড়ি, পাতিল, থালা, বাটি, গ্লাস, চামচ ব্যবহার করা হয় সেগুলো বিশুদ্ধ পানিতে ধুয়ে নিতে হবে। ধোয়া মোছার কাজে যেসব কাপড় ব্যবহার করা হয় সেগুলো অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

১৩। ফল মূল শাক সব্জি ছাড়া অন্যান্য খাবার সংরক্ষণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন সংক্রমণ না ঘটে।

১৪। পানি শুধু ফুটিয়ে খেলেই চলবে না। বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের দিকেও নজর দিতে হবে, যেমন মুখ ধোয়া, গোসল করা, থালা বাসন ধোয়া ইত্যাদি।

বমি যখন বিব্রতকর সমস্যা

বমি নির্দিষ্ট কোনও রোগ নয়। তবে এটি অনেক রোগের নির্দেশক। সাধারণত লালা নিঃসরণ এবং বমি বমিভাবই বমির প্রাথমিক স্তর। পরিপাকতন্ত্রের যে কোনও রোগের তীব্র অবস্থায় বমি হতে পারে। এছাড়া মেনিন্‌জাইটিস, ইউরেমিয়া, মাইগ্রেনের ব্যথা, আবার কিছু কিছু ওষুধ সেবন করলেও বমি হয়।

আবার ছোট শিশুদের মাঝে মাঝে পেটের গোলমালের জন্য বমি হয়ে থাকে। এ ধরনের সাধারণ বমি বিশেষ কোনও কারণে হয় না। আপনা আপনিই সেরে যায়। আবার ইনফেক্‌শনের জন্যও বমি হয়ে থাকে।

www.banglainternet.com

নির্দিষ্ট রোগ নির্ণয়ে বমির প্রকারভেদ

১। কোনও রকম বমি বমি ভাব ছাড়া হঠাৎ বমি শুরু হলে মাথার খুলির ভেতরের রোগ নির্দেশ করে। ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে এমনটি হয়ে থাকে।

২। সকালে ঘুম ভাঙ্গলে বমি বমি ভাব হওয়া, গর্ভাবস্থা, মদ্যপান বা মানসিক উদ্বেগ নির্দেশ করে।

৩। সন্ধ্যায় কিংবা রাতে যদি প্রচুর বমি হয় এবং ২৪ ঘণ্টা পূর্বের খাদ্য অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে বুঝতে হবে পাকস্থলীর নির্গম পথে সৃষ্ট বাধার নির্দেশক।

৪। রোগী যদি প্রচুর মদ্যপান করে কিংবা প্রচুর পরিমাণে কেক, চকোলেট কিংবা দুগ্ধজাত খাবার খেয়ে থাকে তাহলেও বমি হতে পারে।

৫। পেপ্‌টিক আলসারের কারণেও বমি হয়। আবার পাকস্থলীতে রক্তক্ষরণ হলেও বমির সাথে রক্ত যায়।

৬। পড়ে গিয়ে যদি মাথার পেছনে আঘাত লাগে কিংবা ব্রেন হেমারেজের কারণেও বমি হয়।

৭। ভ্রমণের বিড়ম্বনার কারণে অনেকে বমি করে থাকেন।

৮। বিভিন্ন ধরনের মানসিক অসুস্থতাতেও রোগী প্রায়শই বমির অভিযোগ করে থাকেন।

৯। মারাত্মক হার্ট ফেলিওর হলেও বমি হয়ে যায়।

১০। পঁচা খাবার থেকে বিষক্রিয়ার কারণে বমি হয়ে থাকে।

১১। পেটের কোনও তীব্র যন্ত্রণা বা নাড়িভুঁড়িতে কিছু আটকে গেলে বমি হয়।

১২। এপেনডিসাইটিস থেকেও বমি হয়।

১৩। বেশি জ্বর বা সাংঘাতিক যন্ত্রণা হলে বমি হয় যেমন– ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস, প্রস্রাবে সংক্রমণ, টনসিলে সংক্রমণ ইত্যাদি।

বমি হলে করণীয়

১। যতক্ষণ অতিমাত্রায় বমি হতে থাকবে ততক্ষণ শক্ত খাবার দেওয়া যাবে না।

২। রোগীকে খাবার স্যালাইন দিতে হবে।

৩। ভ্রমণে গেলে, বমির সমস্যা হলে, ভ্রমণে যাওয়ার পূর্বে বমি বন্ধের ওষুধ খেয়ে নিতে হবে।

www.banglainternet.com

৪। পড়ে যাওয়ার ফলে বমি হলে মাথায় বরফ পানি ঢেলে সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

৫। গর্ভাবস্থায় 'মর্নিং সিকনেসের' জন্য মেয়েদের বমি হয় কিংবা বমির ভাব হয়। সকালে উঠে কিছু খেয়ে ফেললেই এ উপসর্গগুলো চলে যায়।

৬। খাদ্যে যাতে বিষক্রিয়া না ঘটে এজন্য রাস্তার বাসি কিংবা পঁচা খাবার খাওয়া যাবে না।

৭। বমি যদি গাঢ়, সবুজ কিংবা খয়েরী রঙের হয় এবং তাতে যদি মলের গন্ধ থাকে তবে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

৮। বমি বন্ধের জন্য ওষুধ খেয়ে ৫ মিনিট অন্য কিছু খাওয়া যাবে না।

৯। বমি বন্ধ হয়ে গেলে যতক্ষণ রোগীর প্রস্রাব না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্যালাইন খাইয়ে যেতে হবে।

১০। বমি আর পাতলা পায়খানা যদি সাংঘাতিক রূপ ধারণ করে এবং ২৪ ঘণ্টার অধিক সময় ধরে চলে। কিংবা মুখ বা মলদ্বার দিয়ে ওষুধ দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে তবে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে।

www.banglainternet.com

উনবিংশ অধ্যায়

কিছু মহামারী রোগ

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়া হলো রক্তের সংক্রমণ জনিত জ্বর। ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায় মশা। কোনও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীকে যদি মশা কামড়ের পরে সুস্থ কোনও মানুষকে কামড়ায় তবে সেই ব্যক্তিও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

ম্যালেরিয়ার লক্ষণ বুঝবেন কি করে

১। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে এবং ১৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা পর্যন্ত কাঁপতে থাকে। সেই সাথে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা থাকে।

২। রোগীর প্রচণ্ড জ্বর হয়। জ্বরের সাথে চোখ মুখ লাল হয়ে যায়। কখনও কখনও রোগী বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়ে জ্বর কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে।

৩। পরবর্তী পর্যায়ে রোগী অত্যধিক ঘামতে থাকে এবং এক পর্যায়ে জ্বর ছেড়ে যায়। ঐ সময়টাতে রোগী অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়ে যায়, সেই সাথে দুর্বলতাও বোধ করে।

৪। বর্ষাকালে কারও যদি জ্বর হয় তবে ম্যালেরিয়া আছে কি-না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

কিভাবে চিকিৎসা করবেন

১। ম্যালেরিয়া বলে সন্দেহ হলে নিকটস্থ হাসপাতালে গিয়ে রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ মতো ওষুধ সেবন করতে হবে।

২। যার ম্যালেরিয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে তার যদি ফিটের লক্ষণ থাকে তবে তার মগজে ম্যালেরিয়া হয়েছে ধরে নিতে হবে। তখন সাথে সাথে ডাক্তারী সাহায্য নিতে হবে। কারণ এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক।

www.banglainternet.com

ম্যালেরিয়া কিভাবে প্রতিরোধ করবেন

১। মশা এড়িয়ে চলতে হবে। সব সময় মশারী টাঙিয়ে শুতে হবে। মশারী না থাকলে চাদরের নিচে ঘুমোতে হবে।

২। শিশুর দোলনাতে মশারী কিংবা পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

৩। যদি বাড়িতে কারও জ্বর থেকে থাকে তবে তার রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে।

৪। যদি কারও ম্যালেরিয়া হয়েছে বলে মনে হয়, তবে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করাতে হবে। নতুবা তার থেকে অন্যদের মাঝেও এ রোগ ছড়াবে।

৫। মশা এবং তাদের শুক্রকীট ধ্বংস করতে হবে। মশা সাধারণত বদ্ধ পানিতে জন্মায়। এজন্য আশেপাশের ডোবা, গর্ত, পুরনো টিন কিংবা ভাঙ্গা পাত্রে পানি জমে থাকলে সেগুলো পরিষ্কার করতে হবে। খাবার পানির পাত্র ঢেকে রাখতে হবে।

টাইফয়েড জ্বর

টাইফয়েড হলো অন্ত্রের একটি সংক্রমণ, দুষিত খাবার এবং পানি থেকে এ রোগ ছড়ায়। এবং একসময় মহামারীর রূপ ধারণ করে।

টাইফয়েড জ্বরের লক্ষণ

প্রথমে সর্দি জ্বর বা ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের মতোই মনে হয়। সামান্য মাথা এবং গলায় ব্যথা হয়।

১ম সপ্তাহে

১। প্রতিদিন একটু একটু করে জ্বর বাড়তে থাকে। পরবর্তীতে ১০৫° পর্যন্তও জ্বর উঠতে পারে।

২। নাড়ীর গতি অত্যন্ত ধীর হয়ে যায়।

৩। কখনও কখনও রোগীর বমি হতে পারে, কখনওবা পাতলা পায়খানা হয়। আবার কখনও কোষ্ঠকাঠিন্যও হতে পারে।

২য় সপ্তাহে

১। জ্বর খুব বেশি বেড়ে যায়। নাড়ীর গতি অত্যন্ত কমে যায়।

২। রোগীর শরীরে গোলাপী রঙের দানা দানা দেখা যায়।

৩। রোগী বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

৪। রোগীর শরীরের ওজন কমে যায় এবং পানিশূন্যতাও দেখা দেয়।

www.banglainternet.com

তৃতীয় সপ্তাহ

১। রোগী কোমাতে চলে যায়।

২। রোগী মৃত্যুবরণও করতে পারে।

টাইফয়েডের চিকিৎসা

১। টাইফয়েড হয়েছে এটি বুঝতে পারলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।

২। জ্বর বেশি হলে শরীর স্পঞ্জ করে এবং মাথায় আইস ব্যাগ দিয়ে জ্বর কমাতে হবে।

৩। রোগীকে যথেষ্ট পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে, তবে সেই খাদ্য তরল হতে হবে।

৪। শরীরে পানির অভাব যাতে পূরণ হয় এজন্য প্রচুর তরল খাবার যেমন– ডাবের পানি, ফলের রস, স্যুপ, খাবার স্যালাইন এবং সেই সাথে প্রচুর পানি পান করাতে হবে।

৫। জ্বর সেরে যাবার পরও রোগীকে বেশ কিছুদিন পরিপূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে।

টাইফয়েড প্রতিরোধের উপায়

১। টাইফয়েড এড়াতে হলে প্রথমেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে। মানুষের মল দিয়ে যাতে খাবার এবং পানি দূষিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২। রাস্তার খোলা খাবার খাওয়া কখনও উচিত নয়।

৩। সাধারণত বন্যা কিংবা অন্যান্য দুর্যোগের পর টাইফয়েড রোগ দেখা দেয়। তাই বন্যা দুর্গত এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে। এ সময় পানি ফুটানো ছাড়া পান করা যাবে না।

৪। ঘরের মধ্যে যার টাইফয়েড হবে তাকে আলাদা পাত্রে খাবার দিতে হবে এবং সেই পাত্রে আর কেউ খেতে পারবে না। রোগীর মল মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। পরিচর্যাকারী সেবা করার পর হাত ধুয়ে ফেলতে হবে।

৫। টাইফয়েড ভাল হয়ে গেলেও কেউ কেউ রোগের জীবাণু বহন করে থাকে। এরা অন্যদের মধ্যেও এ রোগ ছড়াতে পারে। এজন্য যে টাইফয়েডের জীবাণুর বাহক তার নিজের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে বাড়তি যত্ন নিতে হবে। খাবার তৈরির ব্যাপারে এদের সতর্ক থাকতে হবে।

৬। যারা টাইফয়েড রোগের বাহক তাদেরও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

www.banglainternet.com

কলেরা

কলেরা একটি মহামারী রোগ। কলেরা অত্যন্ত সংক্রামক ও বিপজ্জনক রোগ। এ রোগও একটি পানিবাহিত রোগ। খাদ্য দ্রব্যের মাধ্যমেও কলেরা রোগ ছড়ায়।

কলেরার লক্ষণ

১। কলেরা হলে রোগী চাল ধোয়া পানির মতো অনবরত পাতলা পায়খানা করতে থাকে।

২। কলেরা হলে গায়ে জ্বরও হয়।

৩। শরীরে পানির অভাব হয়ে রোগী মৃত্যুবরণ করে।

কলেরার চিকিৎসা

১। কলেরা হলে রোগীকে খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

২। রোগীকে তরল এবং পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে।

৩। অতি সত্বর ডাক্তারের সাহায্য নিতে হবে তা না হলে রোগী মৃত্যুবরণও করতে পারে।

কলেরা প্রতিরোধ করবেন কিভাবে

১। কলেরা রোগীকে আলাদা ঘরে শোয়াতে হবে। অন্য কেউ যাতে সে ঘরে প্রবেশ না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

২। রোগীর ব্যবহার করা থালা বাসন, কাপড় চোপড় আলাদা করে রাখতে হবে। অন্য কেউ যাতে সেগুলো ব্যবহার না করে।

৩। গ্রামে কলেরা হলে সমস্ত খাবার পানি ফুটিয়ে পান করতে হবে।

৪। সব সময় খাবার এবং খাবার পানি ঢেকে রাখতে হবে যাতে মাছি না বসতে পারে।

৫। রাস্তার ধারের খোলা খাবার খাওয়া যাবে না। কারণ খোলা খাবারে রোগ জীবাণু পড়ে এবং এগুলো থেকেই কলেরা হতে পারে।

www.banglainternet.com

বিংশ অধ্যায়
বয়স্ক লোকদের কিছু রোগ ও তার ঘরোয়া চিকিৎসার পদ্ধতি

আরথ্রাইটিস

সাধারণত বয়স্ক লোকদের আরথ্রাইটিস হয়ে থাকে। এটি হচ্ছে সন্ধির প্রদাহ, সাধারণত মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের এ রোগ বেশি হয়ে থাকে। এই রোগে হাতের আঙ্গুলের সন্ধিসমূহের প্রদাহ হয়ে থাকে। একই ভাবে পায়ের আঙ্গুলের সন্ধিসমূহও আক্রান্ত হয়। সেই সাথে রোগীর ওজন হ্রাস পায়। রোগী অসুস্থ বোধ করে এবং অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। হঠাৎ করে জ্বর হয়ে এ ধরনের রোগ দেখা দিতে পারে। সাধারণত হাঁটু, উরুসন্ধি, কাঁধ, কব্জি, কনুই প্রভৃতি সন্ধি এবং গ্রীবাদেশের অস্থিসমূহ এতে বেশি আক্রান্ত হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা

আপনার মধ্যে যদি আরথ্রাইটিসের কোনও উপসর্গ প্রকাশ পায় তবে নিজের ডাক্তারী নিজে করবেন না। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যথা নিরাময়ের ওষুধ খেতে হবে।

১। ব্যথাযুক্ত গাঁটগুলোকে বিশ্রাম দিতে হবে।

২। প্রয়োজনে ব্যথাযুক্ত স্থানে গরম সেঁক দিতে হবে।

৩। সকল ধরনের আরথ্রাইটিসের জন্য ফিজিওথেরাপী হচ্ছে বেশ কার্যকরী চিকিৎসা। আক্রান্ত যে সন্ধিতে এখনও প্রদাহ শুরু হয়নি সেগুলোর ক্ষেত্রে সন্ধি শক্ত হয়ে যাওয়া এবং আশেপাশের মাংসপেশীকে সুস্থ রাখার জন্য ব্যায়াম অত্যন্ত দরকারী, এতে কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

স্ট্রোক

কতগুলো রক্তবাহী নালীর মাধ্যমে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ হয়। মস্তিষ্কে অক্সিজেন এবং পুষ্টি সরবরাহই এই রক্ত প্রবাহের মূল লক্ষ্য। যদি কোনও কারণে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহকারী নালী ছিঁড়ে যায় কিংবা রক্তপিণ্ড জমে তবে এ সমস্ত

www.banglainternet.com

রক্তনালীতে রক্তপ্রবাহ বিঘ্নিত হয়। ফলে মস্তিষ্ক প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও অক্সিজেন পায় না। তখন মস্তিষ্কের কোষসমূহ ধ্বংস হতে থাকে। এ ধরনের একটি অবস্থাকেই স্ট্রোক বলে।

স্ট্রোকের লক্ষণগুলো

একজন মানুষ কি ধরনের স্ট্রোকে আক্রান্ত হতে পারেন এটি নির্ভর করে ঐ লোকটির বয়স ও স্বাস্থ্যের ওপরে। কোনও কোনও সময় সামান্য মাথা ব্যথাতেই স্ট্রোক হয়ে থাকে। যদি রোগী একটু বয়স্ক হয় কিংবা হার্ট ও ফুসফুসের সমস্যা থেকে থাকে তবে এই সামান্য মাথা ব্যথাও মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

১। মাথা ব্যথা।
২। মাথা ঘোরা।
৩। হঠাৎ করে শরীরের একপাশ অবশ হয়ে যাওয়া।
৪। শরীর নাড়াচাড়া করতে না পারা।
৫। হঠাৎ করে মুখভঙ্গি প্রকাশ করতে অসমর্থ হওয়া।
৬। কথা বন্ধ হয়ে যাওয়া।
৭। নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পাওয়া।
৮। শ্বাস প্রশ্বাসে অসুবিধা।
৯। বমি বমি ভাব।
১০। খিঁচুনী।
১১। দু'চোখের পিউপিল দু'রকম হওয়া।
১২। সঙ্গালোপ পাওয়া।

www.banglainternet.com

জরুরী কর্তব্য

আপনার নিকট আত্মীয় (মা, বাবা, ভাই বোন ইত্যাদি) ছাড়াও আপনার পাশেই একজন স্ট্রোকে আক্রান্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনি যদি একজন চিকিৎসক নাও হোন তারপরও আপনার কিছু কর্তব্য থেকে যায়। যে কাজগুলো আপনি নিজেই করতে পারেন। যেমন–

যে সকল রোগী অজ্ঞান হয়নি তাদের ক্ষেত্রে ঃ

১। রোগীর চারপাশে মুক্ত বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। রোগীকে হেলান দিয়ে শুইয়ে দিতে হবে।

৩। রোগীর উপসর্গ কি কি তা খেয়াল করতে হবে।

৪। রোগীকে শান্ত রাখতে হবে। এ ধরনের রোগীরা যদি জ্ঞান নাও হারান তবুও আশেপাশের সব কথা শুনতে ও বুঝতে পারেন। এজন্য এসময় এমন কোনও কথা বলা যাবে না যা রোগীর মনে ভয়ের সঞ্চার করে।

৫। রোগীকে কিছুই খেতে দেওয়া যাবে না।

৬। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৭। প্রয়োজনে অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে হবে।

যারা অজ্ঞান হয়ে পড়েন তাদের ক্ষেত্রে

১। রোগীর চারপাশে মুক্ত বাতাসের ব্যবস্থা করুন।

২। প্রয়োজনে অক্সিজেন দেবেন।

৩। রোগীর শরীরের যে পাশ অবশ হবে সে পাশটি নিচের দিকে রাখুন।

৪। রোগীর উপসর্গগুলো লক্ষ্য করুন।

৫। রোগীকে পাশ ফিরিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় রাখুন।

৬। অতিসত্বর চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।

ডায়াবেটিস কি

রক্তে শর্করার পরিমাণ যদি স্বাভাবিকের চাইতে অনেকগুণ বেশি হয়ে থাকে তাকে ডায়াবেটিস বলে। রক্তে যখন শর্করা বেশি বেড়ে যায় তখন প্রস্রাবের সাথে এই শর্করা বের হয়ে যায়। যদি ডায়াবেটিস হয়ে থাকে তবে শর্করা কিংবা মিষ্টি জাতীয় খাবার দেহের কাজে লাগে না।

www.banglainternet.com

মানসিক চিন্তা ভাবনার জন্যই ডায়াবেটিস হয়ে থাকে। আবার বংশগত কারণ কিংবা মেদাধিক্য ঘটলেও ডায়াবেটিস হয়। ডায়াবেটিস আমিষ ও চর্বির উপযুক্ত বিপাক কার্যে গন্ডগোল ঘটায়। সাধারণত ইনসুলিনের অভাবেই এ রকম হয়ে থাকে। ইনসুলিন এক জাতীয় জৈব রস। ইনসুলিন রক্তে আমিষের পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকে। ইনসুলিন রক্তে আমিষ, শর্করা এবং চর্বিজাতীয় খাদ্যের বিপাক ঘটায়।

ডায়াবেটিসের লক্ষণ বুঝবেন কি করে

১। ক্ষুধা খুব বেশি বেড়ে যাওয়া।

২। প্রস্রাব ঘন ঘন হওয়া।

৩। পানির পিপাসা বোধ করা।

৪। শারীরিক ক্লান্তি এবং দুর্বলতা বোধ করা।

৫। নানা ধরনের চর্মরোগ বেড়ে যাওয়া।

৬। চোখে ঝাপসা দেখা।

৭। ক্ষত শুকোতে বিলম্ব হওয়া।

অনেক সময় এ ধরনের লক্ষণ শুধুমাত্র অল্প বয়স্কদের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে হয় না।

www.banglainternet.com

কাদের ডায়াবেটিস বেশি হয়

১। যাদের বংশে কেউ না কেউ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছে।

২। যারা পরিশ্রম করে না।

৩। মেদবহুল শরীর।

৪। মাঝ বয়েসী এবং বয়স্ক লোকদের ক্ষেত্রে।

৫। যদি দীর্ঘদিন যাবৎ কর্টিসোন জাতীয় ওষুধ সেবন করে থাকে।

৬। অপুষ্টির কারণে।

ডায়াবেটিস হলে সাধারণত কি ধরনের জটিলতা হয়ে থাকে

ডায়াবেটিস যদিও একটি রোগ কিন্তু দেখা যায় এ রোগের জটিলতা অনেক। ডায়াবেটিস যদি নিয়ন্ত্রণে রাখা না যায় তবে দেখা যায় যে, বছর কয়েক পরেই নানা রকম জটিলতা এসে উপস্থিত হচ্ছে।

১। হৃদপিণ্ড ও রক্তবাহী নালীর জটিলতা।

২। বিভিন্ন ধরনের ফুসফুসের জটিলতা (যক্ষা)।

৩। কিডনী সংক্রান্ত জটিলতা।

৪। দাঁত ও মুখের জটিলতা।

৫। চোখ সংক্রান্ত নানা জটিলতা।

৬। ডায়াবেটিসে পায়ের জটিলতা।

৭। স্নায়ু সংক্রান্ত জটিলতা।

৮। বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ।

৯। যৌন জীবনে জটিলতা।

১০। মহিলাদের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা যায় (অতিরিক্ত ওজনের শিশু, মৃত শিশু, অকালে সন্তান প্রসব, শিশুর জন্মের পর পরই মৃত্যু, ত্রুটিযুক্ত শিশু)।

ডায়াবেটিস থেকে নিজেকে কিভাবে মুক্ত রাখা যায়

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডায়াবেটিস হবার ঝুঁকিও বেড়ে যায় অনেক। তবে এমন কিছু নিয়ম আছে যা মেনে চললে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমানো সম্ভব।

১। পরিমিত ভাবে আহার করতে চেষ্টা করুন।

২। সময়মত খাবার গ্রহণ করুন।

৩। প্রয়োজন অনুযায়ী ক্যালরি গ্রহণ করুন।

৪। ধূমপান বর্জন করুন।

www.banglainternet.com

৫। বয়স এবং স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে ব্যায়াম করুন।
৬। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যায়াম পরিহার করুন।
৭। মদ স্পর্শ করবেন না।
৮। খাবার সময়ে কম খেয়ে পরবর্তীতে অতিরিক্ত খাবেন না।
৯। সকাল-বিকাল কিছু সময় হাঁটুন সেই সাথে ওঠা বসা করলে ভাল হয়।
১০। যতক্ষণ পর্যন্ত না ঘামবেন ততোক্ষণ পর্যন্ত ব্যায়াম করে যাবেন।
১১। চিনি, গুড় এবং মিষ্টি জাতীয় জিনিস খাবেন না।

জরুরী অবস্থা

রোগী যদি খুব বেশি পরিমাণে ইনসুলিন ইনজেকশন নেয়, অথবা খুব কম খায় কিংবা খুব বেশি ব্যায়াম করে থাকে তবে যে অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১। রোগী অতিমাত্রায় ক্ষুধার্ত বোধ করে।
২। শরীরে কাঁপুনির সৃষ্টি হয়।
৩। মাত্রাতিরিক্ত ঘাম হয়।
৪। বুক ধড়ফড় করে।
৫। চোখের দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যায়।
৬। কাজে অমনোযোগী হয়ে যায়।
৭। আঙুল ও ঠোঁট ভার বোধ হয়।
৮। জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

এ অবস্থায় আপনার কি করণীয়

১। চিনি দিয়ে শরবত তৈরি করে ডায়াবেটিস রোগীকে খেতে দিন। এরপর কিছু সময় বিশ্রাম নিতে বলুন দেখবেন রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু যদি মিনিট দশেকের মধ্যেও রোগীর অবস্থার পরিবর্তন না ঘটে তবে ডাক্তারের সাহায্য নিন।

২। ডায়াবেটিস রোগী সব সময় কিছু চিনি বা মিছরী সঙ্গে রাখবেন।

৩। রোগী যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে তবে রোগীকে গুকানন ইনজেক্শন দিতে হবে।

ডায়াবেটিস বেড়ে গেলে আর এক ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়

১। রোগীর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়।
২। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়।

www.banglainternet.com

৩। শ্বাসে এসিটোনের গন্ধ আসে।
৪। রোগীর বার বার প্রস্রাব হয়।
৫। রোগীর ক্ষুধা বেড়ে যায়।
৬। মাথা ব্যথা হয়।
৭। বমির ভাব হয়।
৮। রোগী অত্যধিক পিপাসার্ত বোধ করে।

এ ধরনের সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয় সাধারণত ঃ

১। রোগী অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ করলে।
২। পরিমিত ব্যায়াম না করলে।
৩। কোনও সংক্রমিত রোগ থাকলে।
৪। ইনসুলিন ইনজেক্শন কম নিলে।

এ সমস্যায় করণীয়

১। প্রথমেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
২। রোগীকে বিছানায় শুইয়ে দিন।
৩। ইনসুলিনের পরিমাণ বাড়ান।
৪। চা কিংবা কফি খেতে দিন।

ডায়াবেটিস থেকে যাতে জটিলতার সৃষ্টি না হয় ঃ

১। রোগ যেন না বাড়তে পারে সেজন্য নিয়মিত চিকিৎসা গ্রহণ করুন।
২। ধূমপান থেকে বিরত থাকুন।
৩। শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন।
৪। নিয়মমাফিক এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যায়াম করুন।
৫। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

যারা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত তাদের জন্য কিছু পরামর্শ

১। বেশি চিন্তা ভাবনা করবেন না।
২। অলসতা ত্যাগ করুন এবং সংসারের কিছু দৈনন্দিন কাজে অংশ গ্রহণ করুন।
৩। নিয়মিত এবং পরিমিত পরিমাণে ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তুলুন।

www.banglainternet.com

৪। রক্ত ও প্রস্রাব নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করুন।

৫। সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার চেষ্টা করুন।

৬। পরিমিত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করুন।

৭। আহার যেন সুষম হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।

৮। রাতে ঘুমোতে যাবার পূর্বে এবং যখনই খাবার খাবেন তখনই দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করে নেবেন।

৯। খাদ্য ও ওজন নিয়ন্ত্রণ করুন। ওষুধ গ্রহণ করুন, নিয়ম কানুনগুলো মেনে চলুন এবং তা যেন চিকিৎসকের পরামর্শ মতো হয়।

১০। নিয়মিত ওজন পরীক্ষা করুন।

১১। শরীরের ঘা বা ক্ষত যদি শুকোতে দেরী হয়, তবে অতিশীঘ্র ডাক্তার দেখান।

১২। পায়ের যত্ন নেবার জন্য নরম জুতো ব্যবহার করুন।

১৩। খালি পায়ে হাটবেন না। পায়ের মোজা পরিষ্কার রাখুন।

১৪। পায়ের রঙের কোনও পরিবর্তন যদি দেখে থাকেন, তবে আপনার চিকিৎসককে জানান।

১৫। পায়ের নখ যখন কাটবেন তখন লক্ষ্য রাখবেন পা যাতে না কাটে।

১৬। শুকনো তোয়ালের সাহায্যে দু'আঙ্গুলের মাঝে মুছে রাখুন। আপনার পা-কে আঘাত থেকে রক্ষা করুন।

১৭। ইনসুলিন নিলে রোজা রাখতে পারবেন না। আবার যারা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন কিংবা বড়ি খেয়ে থাকেন এরা রোজা রাখতে পারবেন।

উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ

উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ সব সময় বোঝা সম্ভব নয়। অনেক সময় দেখা যায় কোনও রূপ লক্ষণ ছাড়াই এ ব্যাধি নিয়ে মাসের পর মাস অনেকে জীবন যাপন করছে।

বিভিন্ন অঙ্গের লক্ষণ বোঝার উপায়

মাথা ব্যথা, বিশেষতঃ মাথার পশ্চাৎভাগ এবং ঘাড়। বুক ধড়ফড় করে এবং ঘুম হয় না। সকালে ঘুম থেকে উঠলে পা ব্যথা হয়ে থাকে এবং বেলা যখন

www.banglainternet.com

বাড়ে তখন ব্যথা কমে যায়। রক্তচাপ থাকলে হৃদপিণ্ডের অনেক ক্ষতি সাধিত হয়। উচ্চ রক্তচাপ থাকলে অনেক সময় মাথা ঘোরে, কানে ভোঁ ভোঁ করে এবং অল্পতেই বিরক্ত হয়ে যায়। অল্প পরিশ্রমেই শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়ে যায় এবং সেই সাথে বুকে ব্যথা হয় ও রাতে হাঁপানি হয়। উচ্চ রক্তচাপের ফলে যদি মূত্রাশয়ের রোগ হয় তবে শরীর ফ্যাকাশে হয়ে মুখ এবং পা ফুলে যায় সেই সাথে বমিও হয়।

উচ্চ রক্তচাপের ফলে যদি কিডনী ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তবে রাতের বেলা ঘন ঘন প্রস্রাব হয় এবং প্রসাবের সাথে রক্তও যেতে পারে। যদি হাঁটার পর পায়ের মাংসপেশী ব্যথা হয়, তবে বুঝতে হবে পায়ের ধমনী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

অতিরিক্ত জটিলতা দেখা দিলে রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, পক্ষাঘাত গ্রস্থ হতে পারে এমনকি কথা বলাও বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রেণের কিছু ঘরোয়া প্রতিকার

ধূমপান বন্ধ করুন ঃ আপনি যদি উচ্চ রক্তচাপের রোগী হয়ে থাকেন তবে প্রথমেই আপনাকে ধূমপান বর্জন করতে হবে। ধূমপান রক্তনালীর দেয়ালকে শক্ত করে রক্তের ঘনত্ব বাড়ায়।

অতিরিক্ত লবণ খাবেন না ঃ রান্নায় যতটুকু লবণ লাগে ঠিক ততটুকুই লবণ খাবেন। ভাতের সাথে লবণ খাবেন না। লবণাক্ত খাদ্য এড়িয়ে চলুন। যেমন– চিপ্‌স, সস, মাখন, পেস্ট্রি, নোনতা বিস্কুট, টিনজাত খাদ্য ইত্যাদি।

চিৎকার চেঁচামেচি বন্ধ করুন ঃ মৃদু স্বরে কথা বলার অভ্যাস রপ্ত করুন এতে করে রাগের মাত্রাও কমে যাবে। রাগের মাত্রা বেড়ে গেলে রক্তচাপ বিপদসীমা ছাড়িয়ে যায়। এ জন্য অযথা চীৎকার চেঁচামেচি করবেন না, মনকে বশে রাখুন এবং মৃদুস্বরে কথা বলুন।

দেহের ওজন কমাবার চেষ্টা করুন ঃ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে স্থূলতা এবং উচ্চ রক্তচাপের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই আপনি যদি মোটা হয়ে থাকেন তবে দেহের ওজন কমিয়ে ফেলুন।

নিয়মিত এবং পরিমিত ব্যায়াম করুন ঃ নিয়মিত ব্যায়াম করুন এতে করে দেহের ফিটনেস বাড়বে এবং রক্ত চাপ স্বাভাবিক থাকবে। একজন ব্যক্তির ব্যায়ামের ধরন নির্ভর করবে তার বয়স, শারীরিক অবস্থা এবং সুযোগের ওপর। সপ্তাহে অন্তত তিনদিন ২০ মিনিট করে হাঁটুন, সাইকেল চালান অথবা সাঁতার কাটুন। এটুকুই আপনার শরীর চর্চার জন্য যথেষ্ট।

www.banglainternet.com

কফি পানের অভ্যাস বন্ধ করুন ঃ কফি পানের অভ্যাস থাকলে তা বন্ধ করুন এবং যাদের অভ্যাস নেই তারা তা রপ্ত করবেন না।

রোজ রসুন খাবেন ঃ দিনে তিন চার কোয়া কাঁচা রসুন চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করুন।

মাছ খাবেন ঃ সামুদ্রিক মাছ খাওয়ার অভ্যাস করুন। এতে করে 'ওমেগা থ্রি' নামে একটি ফ্যাটি এসিড নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রচুর পটাশিয়াম যুক্ত খাবার খান ঃ বিভিন্ন ধরনের সবুজ টাটকা শাক সব্জি, মটর শুঁটি, সীম, কমলার রস, টাটকা মাছ, মুরগীর মাংস নিয়মিত এবং যথেষ্ট পরিমাণে খাবেন।

নিয়মিত ভ্রমণ করুন ঃ রোজ দু'বেলা স্বাভাবিক গতিতে অন্তত ২ কিলোমিটার হাঁটুন।

প্রতিদিন ভিটামিন 'সি' খাবেন ঃ প্রতিদিন নিয়মিত ভিটামিন 'সি' খেতে যদি পারেন তবে রক্তচাপ অনেক কমে যাবে। এজন্য রোজ অন্তত একটি করে টক জাতীয় ফল অর্থাৎ লেবু, আমলকী, পেয়ারা, টমেটো ইত্যাদি খাবেন।

ক্যালসিয়াম যুক্ত খাবার খান ঃ গবেষকদের মতো ভিটামিন 'সি'-র মতো ক্যালসিয়ামও রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে থাকে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা রোজ দু'কাপ করে মাঠাতোলা দুধ খেতে পারেন।

মনকে প্রফুল্ল রাখুন ঃ অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা রক্তচাপের অন্যতম শত্রু। উৎকণ্ঠা এবং উত্তেজনা পরিহার করে চলুন। ভাল ভাল বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুদের সাথে সুন্দর সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। অযথা পারিবারিক অশান্তি মানসিক অশান্তির মূল কারণ। দৈনিক ৮ ঘণ্টা নিশ্চিন্তভাবে ঘুমান। যাদেরকে পছন্দ হয় এমন লোকের সাথে মেলামেশা করুন, গান শুনুন, ছবি আঁকুন। যা ভাল লাগে তাই করুন।

নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করুন ঃ চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ১৫ দিনে একবার কিংবা মাসে একবার রক্তচাপ পরীক্ষা করুন।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ুন ঃ নিয়মিত নামাজ পড়ার চেষ্টা করুন। সেই সাথে সময় পেলে কোরআন তেলওয়াত করুন। এতে রাগ উদ্বেগ ও মানসিক অবসাদ কমবে।

উপরোক্ত নিয়মগুলো একজন উচ্চ রক্তচাপের রোগী ছাড়াও সুস্থ কোনও ব্যক্তিও যদি মেনে চলেন তবে উচ্চ রক্তচাপ রোধ করা সম্ভব।

হৃদপিন্ডের অসুখ ও করণীয়

বয়স্ক লোকদের বিশেষ করে যারা মোটা, যারা ধূমপান করেন কিংবা যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে এদের মধ্যে হৃদপিণ্ডের সমস্যা দেখা দেয়।

www.banglainternet.com

হৃদপিণ্ডের অসুখে উপসর্গগুলো

১। শ্বাস নিতে কষ্ট।

২। বুক ধড়ফড় করা।

৩। যদি এনজাইনার ব্যথা হয় তবে হার্ট অ্যাটাকের মতো প্রচন্ড ব্যথা না হলেও বুকের ঠিক মাঝখানে বেশ ব্যথা হয়। আর এ ব্যথা হয় সাধারণত শারীরিক পরিশ্রমের পর যেমন– ব্যায়াম করলে, দৌড়ালে বা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলে।

৪। যদি হার্ট অ্যাটাক হয় তবে বুকের মাঝখানে ব্যথা হয় এবং এ ব্যথা খুব তীব্র হয়, ভীষণভাবে শরীর ঘামতে থাকে এবং অনেক সময় রোগী অজ্ঞান পর্যন্ত হয়ে যায়।

হার্ট অ্যাটাক রুখবেন কি করে

১। যদি ধূমপান করে থাকেন তবে তা বন্ধ করে দিন। আর যদি না পারেন তবে কমিয়ে দিন।

২। হার্টের গোলমাল থাকলে কঠোর পরিশ্রম করা উচিত নয়।

৩। চর্বি জাতীয় খাবার কমিয়ে দিন।

৪। ফল, শাক সব্জি, মুরগির মাংস, মাছ ইত্যাদি বেশি করে খাবেন। সেই সাথে ফাইবার যুক্ত খাবার খাবেন যেমন– রুটি ইত্যাদি।

৫। প্রতিদিন পরিমিতভাবে কিছু ব্যায়াম করার চেষ্টা করুন। যেমন– যোগাসন, এরোবিক্স কিংবা কোনও খেলা। যদি ব্যায়ামগুলো করতে না পারেন তবে হাঁটার চেষ্টা করুন।

৬। স্ট্রেচ বা কাজের চাপ কমান। এ ব্যাপারে করণীয় কি ও আপনার চাহিদার সীমারেখাকে বাস্তবমুখী করুন। উচ্চাকাঙ্খা ভাল তবে বেশি উচ্চাকাঙ্খা হার্টের পক্ষে ক্ষতিকর। যদি কোনও একটি লক্ষ্যে পৌছাতে গিয়ে আপনি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন, তবে লক্ষ্যে পৌঁছে আপনার লাভটা কোথায় ? যদি সাফল্যের মধুর ফলই ভোগ করতে না পারলেন তবে সাফল্যের সার্থকতা রইল কোথায় ?

দিনের কোনও না কোনও সময় একান্ত নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখুন। নিজের সঙ্গে একা থাকাটা একান্ত জরুরী।

www.banglainternet.com

হার্টের রোগী যদি বাড়িতে থাকে, তবে কিছু নিয়ম বাড়ির লোকদের জানা একান্ত প্রয়োজনীয়

পালস দেখা ঃ প্রথমেই রোগীর পালস দেখবেন। পালস যদি না পেয়ে থাকেন তবে ১০ মিনিটের মধ্যেই ম্যাসেজ শুরু করে দিন। যখন ম্যাসেজ শুরু করবেন তখন রোগীকে শুইয়ে মুখে আঙ্গুল দিয়ে দেখবেন মুখে কিছু আছে কি-না। যদি মুখে থুতু বা অন্য কোনও কিছু থেকে থাকে তবে তা সরিয়ে ফেলবেন।

এরপর ডাক্তার ডাকুন এবং সেই সাথে বুক ম্যাসেজ করবেন, এরপর মুখে মুখ দিয়ে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস চালাবেন। প্রথমেই রোগীর নাকটা টিপে মুখটা হা করিয়ে নেবেন। এরপর মুখে মুখ লাগিয়ে শ্বাস নিয়ে শ্বাস ছাড়বেন। এ কাজ খুব জোরে করবেন যাতে করে রোগীর বুকটা খুব ফুলে ওঠে।

ডান হাতের চেটোর শেষ অংশটুকু দিয়ে বুকের মাঝ বরাবর ম্যাসেজ করুন।

মাটিতে বসে পড়ুন। ডান হাতের চেটোর ওপর বাম হাতটা রাখুন। এরপর চাপ প্রয়োগ করুন। চার সেকেন্ড পর পর তিনবার করে চাপ প্রয়োগ করুন। ছ'বার হয়ে গেলে আবার মুখে বাতাস দিন। চাপটা খুব জোরে যেন না হয়।

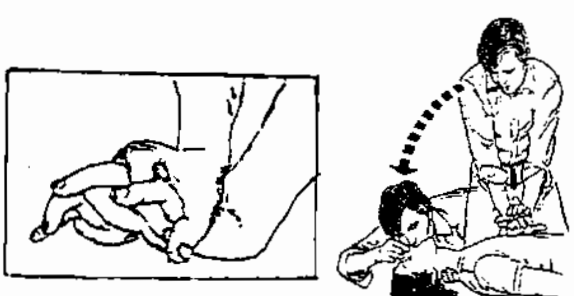

www.banglainternet.com

Goto List >

একবিংশ অধ্যায়

দেহের ছোটখাটো কিছু উপসর্গ নিরাময়ে ম্যাসেজের ভূমিকা

আপনার শরীরে কি কখনও কোনও ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠেছে ? তখন আপনি কি করেছেন ? নিশ্চয়ই ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছেন ? আপনার শরীরের যে কোনও অংশে হঠাৎ করে যদি কোনও ধরনের মারাত্মক ব্যথা অনুভব করে থাকেন তবে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া ভাল। কারণ অনেক সময় কিছু কিছু ব্যথা যে কোনও মারাত্মক রোগের ইঙ্গিত বহন করে থাকে আবার নাও করতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে এমন অনেকেই আছেন যারা ব্যথাকে কোনও রকম আমল দিতে চান না। এবং কোনও রকম ডাক্তারের পরামর্শও নিতে চান না।

মাথা ব্যথা

কখনও মাথা ব্যথা হয়নি এমন লোকের সংখ্যা অত্যন্ত নগন্য। মাথা ব্যথা হলে অনেক সময় দেখা যায়, মাথা ব্যথার সাথে ঘাড়ের মাংসপেশীতেও ব্যথা হয়।

অনেক সময় মাথা ব্যথার সাথে বমির ভাব হয়। ঘুম ঘুম ভাব হয় এবং অনেক সময় আলো ও শব্দের প্রতিও সংবেদনশীলতা দেখা যায়। মাথা ব্যথার ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের উপসর্গ দেখা যায়। চিকিৎসা ছাড়াই ৮৫/৯০ ভাগ মাথা ব্যথা ভাল হয়ে যায়।

মাথা ব্যথার কারণ

উত্তেজনা, মানসিক অস্থিরতা, টেনশন, সাইনাসের প্রদাহ, চোখ, নাক, কান, গলা, কিংবা মেনিন্‌জাইটিস ও মস্তিষ্কের টিউমার জনিত কারণে মাথা ব্যথা হতে পারে। আবার মাইগ্রেণের কারণেও মাথা ব্যথা হয়।

www.banglainternet.com

টেনশনের মাথা ব্যথার লক্ষণ

১। টেনশন থেকে মাথা ব্যথা হলে তা সমস্ত মাথাজুড়ে হয়। ঘাড়ে এ ধরনের ব্যথা বেশি অনুভূত হয়ে থাকে।

২। এই ব্যথা বেশ কয়েকদিন ধরে চলতে পারে। এই ব্যথা কখনও বাড়ে কখনও কমে।

৩। কাজের চাপ যখন বেশি থাকে কিংবা মানসিকভাবে অস্থির হলেই এ ব্যথা হয়ে থাকে।

৪। এ ধরনের মাথা ব্যথায় বমি হয় না। মাথা ব্যথা নিয়েই স্বাভাবিক সব কাজ কর্ম চালিয়ে নেওয়া যায়।

মাইগ্রেণ বা মাথা ধরার লক্ষণ

১। মাইগ্রেণ সাধারণত কমবয়সী মেয়েদের বেশি হয়ে থাকে। মেয়ে ও ছেলের রোগের অনুপাত হয়ে থাকে ৩ঃ১।

২। এ রোগের প্রকোপ দেখা যায় মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাবের পূর্বে এবং বন্ধের পরে।

৩। এ ব্যথা যে কোনও মুহূর্তে শুরু হতে পারে এবং কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

৪। মাইগ্রেণে আক্রান্ত রোগী আলোর দিকেও ঠিকভাবে তাকাতে পারে না।

৫। রোগীর বমির ভাব হতে পারে কিংবা বমি হতেও পারে।

মাইগ্রেণের তীব্রতা বৃদ্ধির কতগুলো কারণ বা ট্রিগার ফ্যাক্টর আছে

মনোদৈহিক– মানসিক চাপ, দুঃশ্চিন্তা, মানসিক অবসাদ, দুর্ভাবনা ইত্যাদি।

পরিবেশগত কারণ– ঋতু পরিবর্তন জনিত, শিল্প কারখানায় পরিবেশ দূষণ জনিত।

ব্যক্তিগত– ধূমপান, সুগন্ধি ব্যবহার, ঝকঝকে আলোকিত, পরিবেশগত কারণ।

শারীরিক পুষ্টিজাত কারণ সমূহ– পনির, চকলেট, লেবুজাতীয় ফল এবং কফিজাতীয় পানীয়।

ঔষধাদি– ড্রাগস বা নেশাজাতীয় ওষুধ সমূহ, জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি।

মাথা ব্যথা যদি মৃদু ধরনের হয় তবে বেশি গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নয়। প্রত্যেকবার মাথা ব্যথায় বেদনা নাশক ওষুধ খাওয়া ঠিক নয়। অধিক মাত্রায়

www.banglainternet.com

প্যারাসিটামল ট্যাবলেট লিভারের ক্ষতি করে। মাইগ্রেণের জন্য যে মাথা ব্যথা হয় ঐ মাথা ব্যথায় ট্রিগার ফ্যাক্টর কিংবা কার্যকারণ সমূহ এড়িয়ে চলতে হবে। এজন্য ঐ কার্যকারণ সমূহ চিহ্নিত করে ওগুলো এড়িয়ে চললে চমৎকার ফল লাভ করা যায়।

মাথা ব্যথায় কি ধরনের ম্যাসেজ কার্যকরী

মাথা ব্যথা হলে অনেক সময় দেখা যায় যে, সামান্য ম্যাসেজ করলেই সেরে যাচ্ছে। মাথা ব্যথার সাতটি স্থান এবং ব্যথা নির্গমনের ছয়টি স্থান চিহ্নিত আছে, চীন দেশীয় অন্য চিকিৎসা পদ্ধতি হলো আকু প্রেসার। এ পদ্ধতিতে মাথার দু'দিকে চারটি স্থানে মাথা ধরার সময়ে বেদনা অনুভূত হয়। এবং ঐ অঞ্চলে যদি বৃত্তাকারে দৃঢ় চাপ প্রয়োগ করা যায় তবে বেদনার উপশম হয়। এই চারটি স্থান হচ্ছে

১। গলা এবং কাঁধের প্রান্ত বিন্দুর মাঝামাঝি স্থান।

২। টেম্পলের মাঝামাঝি স্থান।

৩। মাথার খুলির পেছনে।

৪। নাকের উৎসের উপরিভাগে দৃঢ় চাপ দিয়ে বৃত্তাকারে এবং হালকা ভাবে এবং চারটি স্থানেই মৃদুভাবে মালিশ করে দিতে হবে।

কিভাবে ম্যাসেজ করবেন

১। প্রথমেই চোখের ওপরে আলতো ভাবে চেপে ধরতে হবে।

২। কপালের মাঝলাইন দিয়ে ভুরু থেকে চুলের গোড়া পর্যন্ত চাপ প্রয়োগ করে যেতে হবে।

৩। কপালের ওপর খুবই আস্তে আস্তে হাত দিয়ে মালিশ করতে হবে।

৪। নাকের উৎসের ওপরে চেপে চেপে ম্যাসেজ করতে হবে।

৫। চোখের ভুরুর ওপরও বুড়ো আঙ্গুল ও তজর্নির সাহায্যে চেপে চেপে ম্যাসেজ করতে হবে।

৬। বুকে এবং কাঁধের ওপরেও বৃত্তাকার ভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসেজ করে এর পরবর্তীতে ঘাড়ও ঐ প্রক্রিয়ায় ম্যাসেজ করতে হবে।

৭। ঘাড় ও কাঁধ ম্যাসেজের পর কাঁধ বেয়ে মাথার খুলির দিকে চলে যেতে হবে। এসময় কানের চারিধারে ম্যাসেজ করা উত্তম।

www.banglainternet.com

মাথা ব্যথা এড়াবেন কিভাবে

১। রোদে যখন বের হবেন তখন সানগ্লাস কিংবা ছাতা ব্যবহারের চেষ্টা করবেন।

২। একটানা অনেকক্ষণ যাবত টি.ভি. কিংবা ভি.সি.আর দেখবেন না।

৩। একটানা দীর্ঘসময় ধরে কোনও কাজের দিকে অতিরিক্ত মন যোগ দেবেন না।

৪। নিয়মিত এবং পরিমিত ঘুমোনোর চেষ্টা করুন।

৫। মুক্ত আলো বাতাসে কিছু সময় ধরে বেড়ান।

শরীর এবং মনের অবসর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঘরোয়া অবসাদ দূর করার জন্য রিলাক্সিং এক্সারসাইজ বা অনুশীলনী উপকারী।

একটি অনুশীলনী– একটি চেয়ারে পিঠ সোজা ও দৃঢ় করে বসুন। পা দুটি আরাম করে রেখে হাত দুটি কোলের ওপরে রাখুন। চোখ বন্ধ করে অবসাদ শূন্য ভাবে তিন চার মিনিট নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে হবে। এই অনুশীলন ১৫ মিনিট করলে শরীরের পেশী সমূহ শিথিল হবে এবং মাথা ব্যথাও দূর হবে।

রিফ্লেক্সোলজি ঃ এই তত্ত্ব মোতাবেক মানুষের শরীরের অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি ঘটে বলপ্রয়োগে বিঘ্ন ঘটার ফলে। মানব দেহের পদতলের বিভিন্ন অংশ দেহের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। ঐ অঞ্চলসমূহ ম্যাসেজ করলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের বলপ্রবাহ পুনঃপ্রবাহিত হয়ে রোগ নিরাময় ঘটে। তাই আপনার মাথা ব্যথা হলে ধরে নিতে হবে যে, উদর ভাগে বল প্রবাহে ব্যাঘাত ঘটেছে। উদর ভাগের প্রতিনিধিত্বকারী অংশ হলো বুড়ো আঙ্গুল। তাই পদতলের সামনের দিকটা ভালভাবে ম্যাসেজ করলে মাথা ব্যথা নিরাময় সম্ভব।

গর্ভাবস্থায় ম্যাসেজের প্রয়োজনীয়তা

ম্যাসেজ আমাদের ক্লান্তি মোচনে সহায়তা করে থাকে এবং শিশুর বৃদ্ধি গঠনেও সহায়ক। তবে সাধারণ অবস্থায় যে ম্যাসেজ চলে, গর্ভাবস্থায় সে ধরনের ম্যাসেজ করা কোনও ক্রমেই উচিত নয়। গর্ভাবস্থায় সঠিক ম্যাসেজ শিশু এবং মা উভয়ের জন্যই ভাল। গর্ভাবস্থায় প্রতিটি নারীরই দেহে পরিবর্তন ঘটে থাকে। গর্ভাবস্থায় সঠিক পদ্ধতিতে ম্যাসেজ মায়েদের দেহ ও মনে প্রশান্তি এনে বিভিন্নরকম ভীতি দূর করে থাকে। তবে গর্ভাবস্থায় ম্যাসেজের ক্ষেত্রে ম্যাসেজকারীকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে যেন কোনও ক্রমেই পেটে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে।

পেট ম্যাসেজ

গর্ভাবস্থার প্রথম চার মাস পেট ম্যাসেজ খুব সাবধানে করতে হবে। চাপ প্রয়োগও খুব সাবধানে করতে হবে। কোনও অবস্থাতেই যেন চাপ বেশি না

www.banglainternet.com

লাগে। চার মাসের পর পেট যখন আস্তে আস্তে বড় হতে শুরু করে তখন হাতের মধ্যে অল্প তেল নিয়ে পেটের চার ধারে হাত গোল করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসেজ করবেন। এতে করে গর্ভবতী বেশ আরাম বোধ করবেন।

পিঠের নিম্নাংশ ও নিতম্বের ম্যাসেজ

এই ম্যাসেজের সময় গর্ভবতীকে যে কোনও একপাশে কাত করে শুইয়ে দিতে হবে। এরপর ম্যাসেজকারী পিঠের দিকে হাঁটু গেড়ে বসুন। প্রথমে আঙ্গুল পিঠের নিচের দিকে রাখুন। এরপর গোল করে ঘুরিয়ে, আলতো ভাবে হাতের ওপর ভর রেখে চাপ দিয়ে ম্যাসেজ করতে করতে নিতম্ব ও পিঠের সন্ধিস্থলের দিকে নিয়ে আসুন। এবার হাতকে মুঠো করুন, নিতত্বের ওপর আলতো করে চাপ দিন। এরপর গর্ভবতীকে বলুন ওই অংশের পেশীগুলোকে পুরোপুরি শিথিল করে দিতে।

উরু ম্যাসেজ

গর্ভাবস্থায় অনেক সময়ই দেখা যায় পা কাঁপে। এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হলে গর্ভবতীকে বলুন সামনে পা ছড়িয়ে বসতে। যতদূর সম্ভব পা ফাঁক করে সোজা হয়ে বসতে বলুন। এরপর ম্যাসেজকারী হাঁটু গেড়ে বসে উরুর ভেতরের অংশে হাত রাখুন। এরপর উরুর ওপরের অংশ থেকে হাতের তালুর সাহায্যে খুবই ধীরে ধীরে চাপ দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত হাতটা নামান, এভাবে চাপ দিয়ে দিয়ে পায়ের পাতা পর্যন্ত ম্যাসেজ করুন। বার বার এভাবে ম্যাসেজ করার ফলে পা কাঁপা কমে যাবে।

প্রসবের পরবর্তী ম্যাসেজ

প্রসবের পরবর্তী সময়টুকুতে মহিলারা বিপুল পরিমাণে অবসাদগ্রস্থ থাকেন। অতিমাত্রায় পেশীর দৌর্বল্যের কারণেও এ রকম হয়ে থাকে। গর্ভবতী থাকাকালীন যে অবসাদ বা ক্লান্তি শরীরে জমা হয়, ম্যাসেজ করলে তা অনায়াসে দূর হয়ে যায়। প্রসবের এক সপ্তাহ পরেই এ ম্যাসেজ শুরু করা যায়। প্রসবের পরবর্তী ম্যাসেজ শরীরের জন্য খুবই উপকারী ম্যাসেজ করলে কিছুদিনের মধ্যেই পেটের আকৃতি পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। শরীরের বিভিন্ন ধরনের ব্যথা ও জড়তা কেটে যায়। মহিলারা পুনরায় গৃহস্থালী এবং বাইরের কাজে যোগদানের উপযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠেন।

১। পেটের নিচে থেকে ওপরের দিকে হাত দিয়ে ঘষে ঘষে মালিশ করুন।

২। পেটের চারিদিকে উভয় হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসেজ করুন।

৩। নিতম্বের ওপর দৃঢ়ভাবে চাপ দিয়ে ম্যাসেজ করুন। এরপর পেটের ওপর আড়াআড়ি ভাবে ম্যাসেজ চালিয়ে যান।

৪। শরীরের উভয় পাশ দিয়ে দু'হাত দিয়ে ম্যাসেজ করুন। হাতের গোড়ালির সাহায্যে দৃঢ়ভাবে চাপ দিয়ে দিয়ে ম্যাসেজ করুন। তবে সিজারিয়ান অপারেশন হলে কাটা দাগের ওপর ম্যাসেজ করবেন না।

www.banglainternet.com

পিঠের ব্যথা ও ঘাড়ের ব্যথা

আপনার অঙ্গভঙ্গি আপনার পিঠের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অথবা জঘন্য শত্রু হতে পারে। সুন্দর অঙ্গভঙ্গি মেরুদন্ডের সন্ধিসমূহে সুষম চাপ ফেলে এবং স্বল্পতম প্রচেষ্টায় নাড়াচাড়া সম্ভব করে তোলে। অস্বাভাবিক দেহ ভঙ্গিমা অসুবিধার সৃষ্টি করে। কারণ এটি পেশী সমূহে টান পড়ায় এবং ক্লান্তির সৃষ্টি করে।

কাঁধ এবং পিঠের ম্যাসেজ কিভাবে করবেন

১। অনেকগুলো তেল কিংবা লোশন কাঁধের নিচে ভালভাবে দিয়ে নিতে হবে। দু'হাত থাকবে ঘাড়ের দু'পাশে। কাঁধ থেকে আরম্ভ করে ঘাড়ের গোড়া পর্যন্ত ম্যাসেজ করতে হবে।

২। যেদিক থেকে ম্যাসেজ আরম্ভ করবেন সেদিকে ঝুঁকে বসবেন। দু'হাত ঘাড়ের দু'পাশে রেখে ম্যাসেজ করতে করতে ঘাড় বেয়ে ওপরে উঠে কান পর্যন্ত আসবেন।

৩। ঘাড়ের পেশীর যদি প্রসারণ ঘটানো যায় তবে পিঠ ও মাথার ব্যথা কিছুটা দূর করতে পারবেন। আপনার হাতের অগ্রভাগ দিয়ে পিঠের মধ্যে চাপ প্রয়োগ করবেন এবং পিঠ এক ইঞ্চির মতো হাত দিয়ে টেনে তুলে শিরদাঁড়ার উভয় পাশ দিয়ে ঘাড় পর্যন্ত টেনে আনুন।

৪। শিরদাঁড়ার উভয় পাশে আপনার হাতের তালু ও আঙ্গুলগুলো দিয়ে পিছলানোর মতো করে ম্যাসেজ করবেন। এ ম্যাসেজের সময় ঘাড় থেকে আরম্ভ করে নিচের দিকে নেমে যেতে হবে, কিন্তু শিরদাঁড়ার ওপরে ম্যাসেজ করবেন না। ম্যাসেজকারীর হাত কয়েকবার ওঠানামা করাবেন।

৫। হাতের তালুর ঢালু অংশ দিয়ে ঘাড়ের পাশ থেকে ম্যাসেজ করে কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসুন। এভাবে কাঁধের দু'পাশে কয়েকবার করে করবেন। বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ঘাড় থেকে কাঁধ পর্যন্ত ম্যাসেজ করুন।

৬। পিঠের দু'পাশে ক্রমান্বয়ে ম্যাসেজ করবেন। প্রথমে শিরদাঁড়ার ডান পাশে বৃত্তাকার ভঙ্গিতে দু'হাতে পাশাপাশি রেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসেজ করুন। তেমনি ভাবে বাম পাশে আবার দু'হাত পাশাপাশি রেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসেজ করুন। এ ধরনের ম্যাসেজ অত্যন্ত আরামদায়ক।

৭। পিঠের পেশীকে শিরদাঁড়ার দিকে টেনে টেনে ম্যাসেজ করুন।

৮। ম্যাসেজকারী মুখ নিচের দিকে নামিয়ে রেখে ঘাড়ের দু'পাশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসেজ করুন।

www.banglainternet.com

দ্বাবিংশ অধ্যায়

কিভাবে সুস্থ থাকবেন এবং জীবনকে উপভোগ করবেন তার কিছু ঘরোয়া টিপ্‌স্‌

১। শরীরকে সুস্থ রাখতে হলে ভোরে ওঠার অভ্যাস করুন। বেরিয়ে পড়ুন খোলা আকাশের নিচে, প্রকৃতির কাছাকাছি। ভোরের মনোরম বাতাসে শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনও হয়ে উঠবে তরতাজা।

২। ছাদে বা খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর একদৃষ্টে ৩/৪ মিনিট তাকিয়ে থাকুন।

সবুজ মাঠ বা সবুজ গাছের দিকে তাকিয়ে থাকুন। চোখ ভাল থাকবে। ঘুম থেকে ওঠার পর এবং রাতে ঘুমোতে যাবার পূর্বে পরিষ্কার ঠান্ডা পানির ঝাপটা দেবেন এতে করে চোখের দৃষ্টি ঠিক থাকবে এবং চোখ দুটিও উজ্জ্বল থাকবে। প্রতিদিন গোসলের পূর্বে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের নখে তেল দিন। এতে দৃষ্টি উজ্জ্বল হবে।

৩। ভোরে প্রাতঃভ্রমণে বেরোনোর পূর্বে ভেজানো কাঁচা ছোলা খেলে হৃদরোগ এবং উচ্চ রক্তচাপের সম্ভাবনা এড়ানো যায়।

৪। আটার ভূষিতে অল্প আটা মিশিয়ে চাপাটি তৈরি করে প্রতিদিন একটি করে খান এতে করে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হবে। এভাবে এই চাপাটি ঢেঁড়স কিংবা পেঁপে সেদ্ধ দিয়ে অন্ততপক্ষে ১৫ দিন খেলে তবে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাও দূর হবে।

৫। সকালে অন্তত একদিন খালিপেটে ত্রিফলা (আমলকি, হরিতকি, বহেড়া), চিরতা অথবা নিম গাছের ছাল ভেজানো পানি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। এতে করে লিভার ভাল থাকবে।

৬। ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠে খালি পেটে এক গ্লাস পানি পান করলে ভেতরের সব গ্লানি দূর হয়ে যাবে। ভাত খাওয়ার অন্তত আধ ঘন্টা পরে পানি পান করবেন। পানি পান করার সময় ঢক ঢক করে পান না করে আস্তে আস্তে পান করুন।

www.banglainternet.com

৭। যদি কোনও কারণে হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে পড়েন তবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের রাগ রাগ চেহারার দিকে মিনিট খানেক তাকিয়ে থাকুন এতে করে উত্তেজনা কমে যাবে।

৮। মাসে একদিন হালকা শাক সব্জি, ফলের রস কিংবা বাড়িতে পাতা দই এর ঘোল খেলে শরীর ঝরঝরে থাকবে। সেদিন কোনও রকম ভারী খাবার (ভাত/রুটি) খাবেন না। এছাড়া যদি সপ্তাহে একদিন নিরামিষ খাবার, পর্যাপ্ত ফল এবং টক দই খেতে পারেন তবে সুস্বাস্থ্য অর্জন করতে পারবেন। সেই সাথে শরীর থেকে অবাঞ্ছিত মেদও ঝরে যাবে।

৯। মলমূত্র ত্যাগ করার সময় দাঁতে দাঁত চেপে রাখলে দাঁত মজবুত হয়। এছাড়া দাঁত ব্রাশ করার পরে আঙ্গুল দিয়ে মাড়ি ম্যাসেজ করলেও দাঁত ঝকঝকে থাকে।

১০। শীতের শেষে বাজারে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা আমলকি পাবেন, তখন প্রতিদিন একটি করে কাঁচা আমলকি খাবেন। কাঁচা আমলকিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' থাকে যা চোখ, চুল ও দাঁতকে ভাল রাখবে, পেটের গ্যাসকে সারিয়ে তুলে ত্বকে আনবে এক উজ্জ্বল্য।

১১। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর বজ্রাসনে বসে চুল আঁচড়ান। এতে করে চুল পড়া রোধ হবে এবং চুল সহজে পাকবেও না।

১২। ভাত খাওয়ার পূর্বে প্রতিদিন কিছু রসুন খাবেন। এতে করে বাত হবে না এবং চুলও পড়বে না।

রোগ নিরাময়ে শরীর চর্চা

শরীরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য আপনাকে যে মর্যাদা দান করবে, ভাল পোষাক কখনও তা পারবে না। সুন্দর কোনও বন্য প্রাণীর পোষাকের দরকার পড়ে না তবুও ওরা সুন্দর। এবং এটিই তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য। বছর দশেক পূর্বেও আমরা দৈহিক সৌন্দর্য নিয়ে ততটা সচেতন ছিলাম না, আজ হয়েছি। আগে আমরা নাক, চোখ এবং মুখ নিয়েই শুধু মাথা ঘামাতাম। আজ টিকলো নাকের চাইতেও মানুষকে সুন্দর করে তার সুন্দর শরীর। পাতলা ঠোঁটের চেয়েও মানুষকে সুন্দর করে তোলে তার চটপটে দ্রুত হাঁটাচলা।

আমাদের শরীর অনেকটা ব্যাংকের মতো। ব্যাংকে যদি আমরা টাকা জমিয়েই রাখি কিন্তু খরচ না করি, তবে বছর শেষে সুদে আসলে দ্বিগুণ হবে। ঠিক সেরকম ভাবে আমরা যদি কায়িক পরিশ্রম না করে শুধু খেয়েই যাই তবে শরীরে বাড়তি মেদ জমে যাবে।

www.banglainternet.com

মেদ কেন জমে ?

আমি মনে করি মেদ জমার প্রধান কারণ আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তা। প্রতি ছ'বছর অন্তর আমাদের শরীরের মেটাবলিক রেট কমতে থাকে। তাই আমরা ২০ বছর বয়সে যে খাবার খাই ২৬ বছর বয়সেও যদি সে খাবার খেয়ে থাকি তখনই আমাদের শরীরের ওজন বেড়ে যাবে।

মেদ মজ্জা কি কোনও ধরনের অসুস্থতা ?

মেদ জমা তখনই অসুস্থতায় রূপ নেবে যখন পুরুষদের দেহের ওজন তার স্বাভাবিক ওজনের চাইতে ২০ শতাংশ বেশি হবে এবং মেয়েদের ২৫ শতাংশ বেশি হবে।

শরীরের মেদ বৃদ্ধিতে করণীয়

মেদ বৃদ্ধি পেলে আপনাকে খাদ্যের পরিমাণ কমাতে হবে নতুবা কায়িক পরিশ্রম বাড়াতে হবে।

মেদ বৃদ্ধিতে খাওয়া দাওয়ার বিশেষ ভূমিকা

আমাদের একটি বিশেষ স্বভাব আছে যখন তখন আমরা হুটহাট করে এটা সেটা মুখে দিয়ে ফেলি। এটি অনুচিত। আমাদের এ স্বভাব ত্যাগ করতে হবে। যদি কখনও অসময়ে খিদে পায় তবে মুড়ি, ছোলা কিংবা শশা ও টমেটোর সালাদ খেয়ে নিন। ভাজাভুজি এবং মিষ্টি জাতীয় খাবার খাবেন না। দুপুরের খাবারের চেয়ে রাতে হালকা খাবার খাবেন। রাত আটটার মধ্যেই রাতের খাবার শেষ করুন। কারণ রাতের দিকে আমাদের শরীরের মেটাবলিক রেট কমে যায়। যার ফলে ক্যালরির পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং শরীরে মেদ জমে যায়। রাতে যদি খাবার খেতে দেরী হয় তবে গ্যাস্ট্রিক সহ নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এজন্য প্রতি রাতে খাবার পরে ১৫/২০ মিনিট হাঁটুন। বাইরে হাঁটার ব্যবস্থা না থাকলে ঘরেই পায়চারি করুন।

টেনশন কি

কোনও মা হয়তো জানালা দিয়ে দেখছেন যে, তার ছেলে গাছে উঠছে তখন তার মনে মাতৃসুলভ একটি উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। এই উদ্বেগই হচ্ছে টেনশনের প্রাথমিক অবস্থা। এই উদ্বেগ থেকেই টেনশনের জন্ম। সব উদ্বেগের পরিণতি

www.banglainternet.com

কিন্তু টেনশন নয়। ধরুন কোনও ঘটনা হয়তো ঘটতে পারে আবার নাও ঘটতে পারে। মা যখন দেখতে পাবেন যে, ছেলে গাছে উঠতে উঠতে মগডালে উঠে গিয়েছে তখনই সেই উদ্বেগ টেনশনে পরিণত হয়। সব ধরনের টেনশনের জন্ম হয় 'ভয়' থেকে। যেমন ধরুন পঞ্চাশজন লোকের সামনে দাঁড়িয়ে আপনাকে জীবনের প্রথমবার অভিনয় করতে হচ্ছে, তখনই আপনার ভেতরে টেনশনের সৃষ্টি হচ্ছে। এ সবই ভয়ভীতির অন্যরূপ। আরও যদি গভীরভাবে দেখতে যান তবে দেখবেন– একটি অহংবোধ এই ভীতির জনক।

'আপনি অহংকারী তাই আপনি টেনশনে ভুগে থাকেন' এ কথা যদি আপনি কাউকে বলতে যান তবে দেখা যাবে, সে অত্যন্ত অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু টেনশনের গভীর কারণ এটিই। আমরা যে সমালোচনা করি তা কিন্তু এই অহংবোধ থেকেই। আমরা অন্যকে নিজের চাইতে কাজে কর্মে কিংবা চিন্তা ধারায় খাটো কিংবা অপটু ভেবে থাকি। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, 'প্রতিটি মানুষই নিজেকে অন্যের চাইতে উৎকৃষ্ট ভাবতে ভালবাসে এবং বিশ্বাসও করে।' প্রতিটি মানুষের মনেই এমন একটি বোধ কাজ করে যে, 'আমি বুঝি পৃথিবীর সব বিষয় জেনে ফেলেছি। কিংবা আমি যা করছি বা ভাবছি সেটি বুঝি শুদ্ধ আর অন্যরা যা ভাবছে সবই বুঝি ভুল।' মানুষ যদি চুরিও করে থাকে, তবে সে অবচেতন মনে নিজের পক্ষেই রায় দিয়ে বলে, 'অভাব ছিল বিধায় চুরি করেছি।'

আবার যে ক্ষেত্রে নিজের চাইতে ভাল কাজ কেউ করে থাকে এবং সে সেটি করতে পারছে না সে ক্ষেত্রে যে হতাশা বা হীনমন্যতা জন্ম নেয় তাও কিন্তু এই অহংবোধ থেকেই। নাম, যশ, প্রতিষ্ঠা, ঈর্ষা, ক্রোধ ইত্যাদির জনক যেমন– অহংবোধ ভীতির জনকও তেমনি অহংবোধ। আমরা প্রতিটি কাজেই স্বীকৃতি আশা করে থাকি। যেক্ষেত্রে এই স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে না, তখনই এই টেনশনের জন্ম নেয়। অভিনয়ের সময় আপনার মুখে কথা আটকে গেলে আপনার মনের মধ্যে যে ভাবনার সৃষ্টি হয়, সে ভাবনা থেকে কষ্ট এবং কষ্ট থেকেই টেনশন।

কারা বেশি টেনশনে ভোগেন

সব মানুষই কম বেশি টেনশনে ভুগে থাকেন। আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে আত্মবিশ্বাসহীন ব্যক্তি। জীবনে ব্যর্থ মানুষ থেকে শুরু করে সফল ব্যক্তিটি পর্যন্ত কখনও না কখনও টেনশনে ভুগে থাকেন। কেউ অল্প কেউ বা বেশি টেনশন করে থাকেন। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে যারা অমিশুক প্রকৃতির, অত্যন্ত

www.banglainternet.com

ছোটখাটো সমস্যা যাদেরকে ভোগায়, অল্পতেই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন, নিজের ওপরে আস্থা কম, যারা স্বপ্ন বিলাসী, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সম্পন্ন এবং স্বার্থপর লোক– এরাই বেশি টেনশন করে থাকেন। যাদের নিজের ওপর আস্থা নেই টেনশন করলে এরা মানসিকভাবে আরও দুর্বল হয়ে পড়েন। যারা দুশ্চিন্তাপ্রবন তারা টেনশন করলে আরও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। এবং যিনি স্বপ্ন বিলাসী তিনি সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে আরও বেশি স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরেন। এতে করে সমস্যা তো কমেই না বরং বেড়ে চলে।

টেনশন মুক্তির কয়েকটি উপায়

কি করে মানসিক চাপ এড়াবেন তার জন্য এখন থেকেই চেষ্টা শুরু করুন। মানসিক চাপমুক্ত জীবন পালন করা কারও পক্ষেই খুব একটা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। উচ্চ মানসিক চাপ এখন অতি সাধারণ ঘটনা।

নিম্নে বাস্তবসম্মত কয়েকটি পন্থা উল্লেখ করা হলো যার মাধ্যমে আপনি মানসিক চাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।

১। পথে যাকে পাবেন তার সাথেই দ্বন্দে জাড়িয়ে পড়বেন না। আপনি যদি কারও সাথে যোগাযোগ রাখেন তবে আসলেই কম মানসিক চাপ বোধ করবেন এবং ভারমুক্ত থাকবেন।

২। ধীরে ধীরে কথা বলার অভ্যাস রপ্ত করুন। দ্রুত কথা বলা মানসিক চাপের ইঙ্গিতই তুলে ধরে। আপনি যদি শান্ত ভঙ্গিতে কথা বলে থাকেন এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কথা বলেন, তবে আপনার শ্বাস প্রশ্বাস নিম্ন গতিসম্পন্ন হবে এবং আপনিও কম উত্তেজিত হবেন।

৩। দেহের উত্তেজনা দূর হলে মনের উত্তেজনাও দূর হয়ে পড়ে। এজন্য হালকা ভাবে পায়চারি করুন। দেহের উত্তেজনা তাড়াবার জন্য দেহের পেশীগুলোকে শিথিল রাখুন, দেহে নিস্পৃহ ভাব আনুন।

৪। সব কিছুতে গতি সঞ্চার করুন। যদি আপনার হাতে অনেক কাজ করার ফাঁক থাকে তবে প্রথমে একটি কাজে মনোনিবেশ করুন। আবার কিছুক্ষণ পর অন্যটিতে মনযোগ দিন। পরবর্তীতে আবার প্রথমটিতে ফিরে আসুন। এতে করে আপনি কাজ করার প্রতি যে ভীতিজনক অবস্থার সৃষ্টি হবে তা কাটাতে পারবেন এবং নতুন উদ্যম ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে পারবেন।

৫। চা, কফি ইত্যাদি বার বার খাবেন না। দু'কাপ কফির মধ্যে থাকা ক্যাফেইন আপনার হৃদযন্ত্রের কম্পনকে প্রতি মিনিটে ১৬ বার বৃদ্ধি করবে এবং সেই সাথে আপনি আরও উদ্বিগ্ন ও খিটখিটে হবেন।

www.banglainternet.com

৬। টেনশন হলে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ না হয়ে প্রথমেই টেনশনের মূল কারণ খুঁজে বের করুন। এবং কারণটির সঠিক মূল্যায়ন করুন। এজন্য আপনি বিষয়টিকে একতরফা ভাবে না দেখে তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টি দিয়ে ব্যাপারটিকে পুরোপুরি দেখুন। এতে করে নিজের অবস্থানটা বুঝতে পারা যায় এবং সমস্যার সমাধান করা যায়।

৭। যখনই টেনশন হবে তখনই চিন্তাকে অন্যখাতে বইয়ে দিন। দীর্ঘসময় একই বিষয় নিয়ে চিন্তা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এক্ষেত্রে নামতা পড়তে পারেন কিংবা ১০০ থেকে ১ পর্যন্ত উল্টো দিকে গুনতে পারেন।

৮। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে পারেন। অন্যের সাথে এই আলোচনা কম আনুষ্ঠানিক মনে হবে এবং পরস্পর দৃষ্টি সংযোগ কম হওয়ার জন্য বাড়তি উদ্বেগ ও মানসিক চাপ সৃষ্টি হবে না।

৯। দিন শুরুর সাথে সাথেই কাজ আরম্ভ করবেন। কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ রেখে গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিয়ে দিন শুরু করুন এতে করে বাড়তি সময় বাঁচিয়ে সামান্য আগেই অফিস ছাড়তে পারবেন।

১০। যখনই আপনি মানসিক চাপ বোধ করবেন তখনই শরীর চর্চার জন্য কিছুটা বিরতি গ্রহণ করুন।

১১। যখনই আপনার মন বিদ্রোহ করবে তখনই দৃষ্টি অন্য ঘটনার দিকে নিবদ্ধ করুন। যা আপনার মনযোগ আকর্ষণ করবে। কিংবা এমন কিছু দেখা কিংবা শোনায় মনোনিবেশ করুন যা আপনার মনটাকে ভুলিয়ে রাখবে। তদুপরি ঐ ধরনের ঘটনায় কখনই মনোনিবেশ করতে যাবেন না যা টেনশন বাড়াবে।

১২। খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেন যেমন– কম্পিউটার গেম, একা একা কোনও খেলা অথবা শব্দ হেয়ালী ইত্যাদি। যখন আপনি শব্দ গঠনে হিমসিম খাবেন তখন মানসিক চাপের কথা চিন্তাই করতে পারবেন না।

১৩। টেনশন তাড়াতাড়ি কমিয়ে ফেলার সহজ উপায় ইচ্ছে এমন কোনও ব্যক্তির কাছে আপনার সমস্যাটি বলুন যিনি সহৃদয়, সহানুভূতিসম্পন্ন এবং আপনাকে ভাল পরামর্শ দেবার ক্ষমতা রাখে। এতে করে আপনার মনের কষ্ট উপশম না হলেও অধিকাংশ সমস্যাটিকে অন্য আলোয় দেখতে পারবেন। এ ধরনের সমস্যায় আপনার যদি কোনও ভুল থেকে থাকে তবে ঐ ব্যক্তি আপনার সামনে তা তুলে ধরতে পারবেন।

১৪। কোনও সমস্যায় পড়লে তা নিয়ে একা না ভেবে পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করলে সমাধানের জট খুলে একাধিক সমাধানের পথ উন্মোচিত হবে।

www.banglainternet.com

১৫। যখন আপনার প্রাণ প্রাচুর্য খুব উন্নত থাকে, তখন সবচাইতে বিরক্তিকর কাজগুলো করুন এবং যখন দিনের শেষে নিম্নমাত্রার উদ্দীপনা বোধ করবেন ঐ সময়টাতে শিল্প চর্চা করুন।

১৬। আপনার ঘরবাড়ি যদি জঞ্জালে পরিণত হয়, তখন আপনি নিয়ন্ত্রণহীনতা বোধ করেন। তাই সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে চলে নিজেকে মানসিক চাপমুক্ত রাখুন।

১৭। অন্যের ওপর দোষ দেবেন না। নিজেকে নির্দোষ ভেবে অন্যের ওপর দোষ চাপানোটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এটি মস্ত ভুল। কারণ জীবনটা আপনার। তাই জীবনের সমস্ত ব্যর্থতার দায়িত্বও আপনার।

১৮। বিপর্যয় মুহূর্তে অকথ্য গালিগালাজ না করাই শ্রেয়। ওসব আপনার সমস্যা সমাধানে কোনও ভূমিকা রাখবে না।

১৯। কিছু সময়ের জন্য কাজকর্ম এড়িয়ে চলুন। বাড়ি ফিরে এসে টেলিভিশন দেখলে আপনার ওপরে 'বোঝার ওপর শাকের আঁটি'র মতো চাপ আরও বাড়বে। ঐ সময়টা পরিবার পরিজনদের সাথে কাটান অথবা গান শুনুন।

২০। দীর্ঘ সময় ধরে নানা ঘটনা কল্পনায় ঠাঁই দেবেন না। ভাবতে থাকুন আপনি যা ভাবছেন তা সত্য নয় ওগুলো কল্পনা মাত্র।

২১। সমালোচনার ভয়ে অনেকের মনে টেনশনের জন্ম হয়। মনে করুন যিনি আপনার সমালোচনা করছেন তিনি আপনার কাজের সমালোচনা করছেন– ব্যক্তি আপনাকে নয়। যিনি আপনার সমালোচনা করছেন তিনি সঠিক নাও হতে পারেন। ভাবুন সমালোচনা থেকেই আপনি আপনার কাজের পদ্ধতি এবং নিজের সম্পর্কে চিন্তা করতে পারছেন।

২২। নিয়মিত ভাবে শরীর চর্চা করুন। মনে রাখবেন সুস্থ দেহেই সুস্থ মনের বিকাশ।

২৩। এ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কোনও ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেননি যিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অপরাজিত থেকেছেন। আপনি যদি বুদ্ধি, বিবেক, নীতি এবং মনের জোর দিয়ে লড়াই করেন তবে পরাজয় আপনার মনকে গ্লানিতে ভরে তুলবে না। পরাজয় যেমন কাম্য নয় তেমন পরাজয় অপমানজনকও নয়। এ সাবলীল দৃষ্টিভঙ্গিটুকু আপনাকে টেনশনের হাত থেকে মুক্তি দেবে। 'কেন পারব না' এই মনোভাব থাকা ভাল কিন্তু বার বার চেষ্টার পরও যদি না পারেন তবে হতাশ হবার কারণ নেই। 'আমি পারি' তবে সব কাজ পারি এটি আপনার দাম্ভিকতারই প্রকাশভঙ্গি। আপনি মনে রাখবেন অনেক

www.banglainternet.com

বিখ্যাত ক্ষমতাবান ব্যক্তিই অনেক ব্যাপারে অপদার্থ। আপনাকেই যে সুপারম্যান হতে হবে এমন কোনও কথা নেই।

২৪। স্বপ্ন দেখুন একটু আধটু, তবে পা যেন মাটিতেই থাকে আকাশে না উড়ে। টেনশন যখন খুব বেশি হবে তখন মাঝে মধ্যে জীবন থেকে পালিয়ে যেতে চাইলে নিজেকে এসকেপিস্ট ভেবে ফেলার কারণ নেই। প্রকৃতির কাছাকাছি ঘুরে আসুন। প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা এবং প্রকৃতিতে ঘুরে বেড়ানোটা সুস্থ সুন্দর মন ও শরীরের চাবিকাঠি।

২৫। পূর্ব পরিকল্পিত ছক অনুযায়ী কাজ করুন, ঘুমোতে চেষ্টা করুন। প্রয়োজনীয় ঘুম মাত্রাতিরিক্ত হতাশা, আবেগ এবং মানসিক সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

২৬। মনের শান্তি অর্জনের একমাত্র শক্তিশালী উপায় হলো জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া। এটি করা যায় সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগের মাধ্যমে।

২৭। সব সময়ে নিজেকে নিয়ে ভাববেন না, এতে করে টেনশন বেড়ে যায়। নিজের থেকে মন সরিয়ে অন্য কাজে কিংবা অন্যের কাজে মন দিন। নিজের ভালবাসা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিন।

২৮। নিজেকে একজন অতি সাধারণ মানুষ ভাবুন। দোষ ত্রুটি আপনারও হতে পারে। সব সময় মনে করবেন না যে, আপনি সাধু। বুঝতে চেষ্টা করুন যে, কোনও সংকট সৃষ্টিতে হয়তো আপনারও ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে।

২৯। আপনার বাড়ির আশে পাশেই অনেক ছিন্নমূল মানুষ বাস করে থাকে। যারা নিত্য বিপদের সাথে লড়াই করছে, কিন্তু বিপদে মুষড়ে পড়ছে না। ওরাও কিন্তু মানুষ। মনে রাখবেন, জগতের সবচেয়ে দুঃখী ব্যক্তিটি আপনি নন, বিপদ যাদের নিত্যসঙ্গি তারা যদি বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে আপনি কেন পারবেন না। আপনার সাময়িক ব্যর্থতার অর্থ আপনার পুরো জীবনের ব্যর্থতা নয়।

www.banglainternet.com

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

প্রশান্তিময় ঘুমের কয়েকটি উপায়

দুপুর বেলা আপনি যদি দুর্বল বোধ করেন, তবে ধরে নিতে হবে আপনার আরও বেশি পরিমাণে ঘুমের প্রয়োজন রয়েছে। মনে রাখবেন, আপনার জন্য পর্যাপ্ত ঘুম জরুরী এবং সুখনিদ্রা হচ্ছে চূড়ান্ত। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আপনি যদি মনে করেন আরও খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারলে ভাল হতো, তবে বুঝে নিতে হবে আপনার ইনসমনিয়া বা অনিদ্রা রোগ আছে। আজকাল মানুষের অনেক কাজের চাপ বেড়েছে। এছাড়াও সাংসারিক ঝঞ্ঝাট এবং অন্যের বেগার খাটাতেও ঘুমের নির্ধারিত সময় টুকুতে টান পড়ছে। এ ধরনের ঘুমের ব্যাঘাতজনিত অবসাদের জন্য আপনার শরীরে নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দিবে। শরীর ম্যাজম্যাজ করবে, শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। কোনও ব্যাপারে মনযোগ দিতে ব্যর্থ হবেন। সারাদিন তন্দ্রাচ্ছন্নতায় ভুগবেন। অবশেষে মানসিক ভারসাম্যও নষ্ট হবার উপক্রম হয়। বিশ্বের অসংখ্য লোক এ রোগে ভুগছে। খোদ আমেরিকাতে ১০ কোটি লোক বিশ্রাম নেবার সময় পাচ্ছে না।

সুখনিদ্রার পরিমাণ

ঘুমের গভীরতা ধাপে ধাপে বাড়তে থাকে। তাই প্রতিটি ধাপে কোনও রকম ব্যাঘাত সৃষ্টি করা যাবে না। গণ্ডগোলের মধ্যে আট ঘণ্টা ঘুমোনোর চাইতে আপনার নিরিবিলি ছ'ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট। গবেষকদের মতে সুখনিদ্রা চারটি পৃথক পর্বের সমন্বয়ে গঠিত। এবং এ পর্বগুলো ধীরে ধীরে গভীরতর পর্যায়ে প্রবেশ করে। পর্বগুলো ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেলে আপনার ঘুম ভাল হবে না। শরীর ম্যাজম্যাজ করবে। তাই আপনি যদি ঘুমের সময় নাও বাড়াতে পারেন তবুও ঘুমের মানের উন্নয়ন ঘটান। সবচাইতে ভাল বিশ্রামের জন্য ঘুমের কয়েকটি কৌশল জানিয়ে দেওয়া হলো ঃ

www.banglainternet.com

ঘুমের নির্দিষ্ট সময় মেনে চলুন

প্রতিদিন সকালে নির্দিষ্ট সময়ে বিছানা ছাড়ুন। নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমোতে গেলে এবং ঘুম থেকে জেগে উঠলে অল্প কয়দিনেই দেখবেন আপনার চমৎকার ঘুমের অভ্যাস গড়ে উঠছে। যারা সাধারণত ঘুমের ব্যাপারে অনিয়ম করে থাকেন তাদেরই ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে। দেখা যায় এরা কখনও ৫ ঘণ্টা ঘুমোচ্ছেন আবার কখনও ৮/৯ ঘণ্টাও ঘুমোচ্ছেন। ঘুমোনোর সময় আগপিছ করে পরীক্ষা করে দেখা উচিত কতক্ষণের সুখনিদ্রায় আপনার অবসাদ দূর হবে।

ঘুমের ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করুন

যারা প্রতিরাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে অভ্যস্থ হয়ে গেছেন তারা ঘুমের ওষুধের অভ্যাস ত্যাগ করুন। এগুলো নেশার সৃষ্টি করে। এবং ধীরে ধীরে ঘুমের ওষুধের কার্যকারিতা হ্রাস করে।

ঘুম আসছে না কেন, ভেবে ঘাবড়াবেন না

অনেক সময় হয়তো দীর্ঘক্ষণ যাবৎ এপাশ ওপাশ করলেও ঘুম আসতে চায় না। রাতে ঘুমোতে গেলে যদি বিভিন্ন ধরনের বাজে চিন্তা মাথায় এসে মন বিক্ষিপ্ত হয়, তবে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করবেন। এই সময়টা আপনি উপভোগ করতে পারেন এবং আরামপ্রদ কিছু করতে পারেন, যেমন– আপনি কোনও একটি বই পড়তে পারেন। এভাবে মনযোগ যদি অন্য খাতে বইয়ে দিতে পারেন তবে অল্প সময় পরেই আপনি দেখবেন উদ্বেগ কাটিয়ে উঠে ঘুম ঘুম ভাব অনুভব করছেন।

যদি খাদ্যের কারণে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে থাকে

অতিরিক্ত মশলা যুক্ত খাবার খাবেন না

অতিরিক্ত মশলাযুক্ত খাবার আমাদের বদহজম ঘটায় এবং বুক জ্বালার উপসর্গ ঘটিয়ে থাকে। এ কারণে অতিরিক্ত মশলাযুক্ত খাবার না খাওয়াই উচিত। রাতের বেলা ভারী খাদ্য পরিত্যাগ করুন। যেমন– রাতে যদি চাইনীজ খান তবে তা আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবে। আবার শশা, মটরশুটি, ফুলকপি ইত্যাদি খাদ্যও অনেক সময় ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

www.banglainternet.com

রাতের বেলা কম খাবার গ্রহণ

কথায় বলে 'সকালে খাও রাজার মতো, দুপুরে প্রজার মতো এবং রাতে ফকিরের মতো।' গবেষণায় দেখা গেছে দিনের বেলা মানুষ বেশি কর্মক্ষম থাকে এবং শরীরের সমস্ত ক্রিয়া চালু থাকে। তাই দিনের খাদ্যের ক্যালরি রাতের চাইতে বেশি পাওয়া যায়। অনেকে মনে করে থাকেন যে, বেশি খেলে ঘুম ঘুম ভাব আসবে, তাই রাতে বেশি মাত্রায় খেয়ে থাকেন। এতে হিতে বিপরীত ঘটে থাকে দেখা যায় যে, তখন পরিপাকতন্ত্রের অতিরিক্ত কাজ করতে হচ্ছে। ফলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে থাকে। আবার যদি স্বল্পাহারের জন্য ঠিকমত ঘুম না আসে তবে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য ও সব্জি বেশি করে খাবেন।

খাদ্যের এলার্জি

যদি আপনি বুঝতে পারেন আপনার এই নির্ঘুম অবস্থার জন্য খাদ্যের এলার্জি দায়ী, তবে সে ব্যবস্থা আপনাকেই গ্রহণ করতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন জনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যের প্রতি এলার্জি হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যদি দুধে এলার্জি হয়, তবে পেটের ব্যথায় সমস্ত রাত শিশু কাঁদতে থাকে। এজন্য প্রথমেই আপনাকে নজর দিতে হবে কোন্ খাদ্য থেকে আপনার এলার্জি হচ্ছে। ঐ সকল খাদ্য আপনার খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দিন এবং ঘুম পর্যবেক্ষণ করুন। দ্বিতীয় সপ্তাহে আবার ঐ খাদ্যটিই খেয়ে দেখুন আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে কি-না। যদি ঘটে থাকে তবেই বুঝতে পারবেন যে, ঐ খাদ্য থেকেই আপনার এলার্জির উৎপত্তি।

মাঝরাতে ক্ষুধার্ত বোধ করা

এমন অনেক লোক দেখা যায় যারা হঠাৎ করে মাঝরাতে ক্ষুধার্ত বোধ করেন এবং জেগে উঠেন। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু না খাবেন ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি পাবেন না। প্রকৃত পক্ষে এটি একটি অভ্যাস। এ অভ্যাস দূরীকরণে আপনার সদিচ্ছাই একমাত্র উপায় হতে পারে। কারণ এ অবস্থা বেশ ক্ষতিকারক। যারা সাধারণত একবেলা খান কিংবা আলসারের কারণে বার বার খেয়ে থাকেন, এদের মধ্যে এ অবস্থার সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মধ্যরাতে যখনই আপনি ক্ষুধা অনুভব করবেন, তখনই এ অবস্থা কিছুক্ষণ ধরে চলতে দিন এবং পুনরায় কিছু না খেয়ে যদি শুধুমাত্র এক গ্লাস পানি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, তবে ধীরে ধীরে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবেন।

www.banglainternet.com

ওজন যাতে না বাড়ে সেজন্য উপবাস থাকা

এমন অনেকে আছেন যারা ওজন কমানোর জন্য রাতে একেবারেই খান না। রাতে একেবারে না খেলে ক্ষুধার যন্ত্রণায় ঘুম নষ্ট হয়। ফলে অনেকে বেশ শক্ত ধরনের সমস্যায় পড়ে যান। মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় এবং বিভিন্ন মানসিক ও শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও এভাবে না খেয়ে থাকার ফলে শরীরে ভিটামিনের অভাবও হতে পারে। তাই রাতের বেলা একেবারে উপবাস থাকার চাইতে হালকা কিছু খেয়ে নেওয়া ভাল।

রক্তে শর্করা কম থাকার কারণে

যাদের রক্তে শর্করার পরিমাণ কম থাকে এরাও রাতে ক্ষুধার্ত বোধ করে থাকেন। এরা রাতে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খেলে ভাল হয়। কারণ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার হজম হয় দেরীতে। আবার শর্করার পরিমাণ কমে যাওয়া রোধ করে। তবে ভাজাপোড়া বা মিষ্টি খাওয়া ঠিক নয়। কারণ এতে দ্রুত শর্করার পরিমাণ বাড়লেও আবার তাড়াতাড়ি কমেও যায়।

কফি কিংবা মদে আসক্ত হবেন না

কফির ভেতরে যে ক্যাফেইন থাকে তা আট ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরকে উত্তেজিত রাখে। অতএব ক্যাফেইন সমৃদ্ধ অন্যান্য খাবার যেমন– চকোলেট, কোক, চা ইত্যাদিও পরিহার করুন। অ্যালকোহলে আসক্ত হবেন না। কারণ অ্যালকোহল ঘুমিয়ে পড়তে সাহায্য করে ঠিকই, কিন্তু দেহে তা শোষিত হবার পর পুনরায় দেহকে উত্তেজিত করে ফেলে। তাই পেটে এ দ্রব্য যত বেশি পড়বে তত বেশি ঘুমের বিঘ্ন সৃষ্টি করবে।

সব সমস্যার সমাধান যদি হতে পারে, তবে ঘুমের সমস্যাও সমাধানের উর্ধে নয়। ওপরে উল্লেখিত নিয়ম মেনে চলুন, দেখবেন এক সময় আপনারও সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

নিয়মিত হাঁটার সুফল

আমাদের এই ব্যস্ত ও যান্ত্রিক জীবনে ব্যায়াম করার অবকাশ অনেকেই পান না। কিন্তু শরীরকে সুস্থ ও সক্ষম রাখার জন্য ব্যায়াম প্রতিটি সুস্থ লোকের জন্যই করণীয়। শুধু খাওয়া দাওয়া এবং বিশ্রাম করাই শারীরিক সুস্থতার একমাত্র উপায় নয়। ব্যায়াম করা মানেই যে আপনাকে দৌড়োতে হবে কিংবা সাঁতার

www.banglainternet.com

কাটতে হবে তা কিন্তু নয়। নিয়মিত হাঁটাও কিন্তু আপনার জন্য অত্যন্ত ভাল এবং সহজ ব্যায়াম। প্রতিদিন আধ ঘণ্টা করে আপনি যদি সপ্তাহে চারদিন হাঁটেন তবে আপনার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত উপকৃত হবে। সুতরাং আপনি যদি সুস্থ থাকতে চান, তবে আপনার পা দুটিকে কাজে লাগান।

হাঁটলে কি উপকার হয়

১। মেরুদণ্ড সুস্থিত হয়। মাংসপেশী টানটান হয় এবং পিঠের ব্যথা কমে।

২। আপনি যদি হাঁটেন তবে দাঁড়ানোর চেয়ে মেরুদণ্ডের হাড়ে কম চাপ পড়বে, এমনকি বসে থাকার তুলনাতেও কম চাপ পড়বে।

হাঁটার ফলে পেটের উপকার

নিয়মিত হাঁটার ফলে আপনার পাকস্থলীর কার্যাবলী সুস্থিত হবে, এবং পেটের মেদ কমার ফলে আপনার ওজনও কমবে।

১। নিয়মিতভাবে হাঁটলে আপনার হজম ক্ষমতা বাড়বে।

২। ক্ষুধামান্দ্য প্রতিরোধ হবে।

৩। জগিং করার সময় যে পরিমাণ ক্যালরি ক্ষয় হয় হাঁটলেও সমপরিমাণে ক্যালরিই ক্ষয় হয়।

মাথার উপকার

১। হাঁটার ফলে মাথার খুলিতে রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যায়। এর ফলে মাথা ব্যথার অস্বস্থিকর অবস্থা দূর হয়।

২। প্রাকৃতিক রাসায়নিক এনডোরফিন নিঃসরণের মাধ্যমে উদ্যম বৃদ্ধি পায়।

৩। হাঁটলে মস্তিষ্কের অক্সিজেন সরবরাহ বাড়ে। এর ফলশ্রুতি স্বরূপ চিন্তাশক্তিও বাড়ে।

৪। মস্তিষ্কের শিরা স্থিতিস্থাপক থাকে এবং রক্ত প্রবাহের সচলতা বৃদ্ধি পেয়ে স্ট্রোকের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

হাড়ের উপকার

বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের হাড়ের দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে অনেকে ক্যালসিয়াম সেবন করে স্থূলত্ব অর্জন করে থাকেন। এর শিকার থেকে বাঁচতে

www.banglainternet.com

হলে হাড়ের ব্যায়াম আবশ্যক। শরীরের ওপর ভর নির্ভর ব্যায়াম হাড়ের জন্য উপকারী। যেমন– হাঁটা। ভিটামিন 'ডি' শরীরে ক্যালসিয়ামের পরিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই প্রতিদিন রোদের মধ্য দিয়ে কিছু সময় হাঁটুন। সূর্যালোক আপনার শরীরে ভিটামিন 'ডি' তৈরিতে সাহায্য করবে।

ফুসফুসের উপকার

দৌড়োলে আমরা যেমন হাঁসফাস করতে থাকি, হাঁটলে তেমনটি হয় না। তবুও এটি ফুসফুসের কার্যাবলীকে সংহত করে।

১। ডায়াফ্রামের মাংসপেশীকে শক্তিশালী করে।

২। ব্রঙ্কাইটিসের সম্ভাবনা হ্রাস করে।

৩। ধূমপানের আগ্রহ কমায়।

হৃদপিন্ডের উপকার

১। ধমনীতে জমাটবদ্ধ রক্তের স্নেহপদার্থ দূর করে।

২। রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখে।

৩। হৃদসংবহনালীর উপকার হয়।

www.banglainternet.com

চতুর্বিংশ অধ্যায়

অপুষ্টির শিকার হলে ছেলেমেয়েদের কি কি সমস্যা হতে পারে

১। শিশুর বৃদ্ধি রোধ হয়।
২। শিশুর ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয়।
৩। পেট ফুলে যায়।
৪। শরীর ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে।
৫। নোংরা খাবার খেতে ইচ্ছা হয়।
৬। অত্যন্ত রোগাটে দেখায়।
৭। ফুর্তি চলে যায়।
৮। রাত কানা রোগ হতে পারে।
৯। শিশুর ঠোঁটের কোণে ঘা দেখা যায়।
১০। ঘন ঘন সর্দি এবং অন্য সংক্রমণও হয়।

বেশি অপুষ্টির শিকার হলে

১। ওজন বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় কিংবা খুব কম বাড়ে।
২। চুল পড়ে পাতলা হয়ে যায়।
৩। কখনও দেখা যায় যে মুখ ও পা ফুলে গেছে।
৪। চোখের পানি শুকিয়ে যায়।
৫। মুখের ভেতরে ঘা হয়।
৬। মুখের মধ্যে কালো ছোপ ছোপ দাগ পড়ে, মুখের চামড়া উঠে ঘা-এর সৃষ্টি হয়।
৭। স্বাভাবিক ভাবে বুদ্ধি বাড়ে না।
৮। অন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।
৯। হাসতে খেলতে ইচ্ছা হয় না।

www.banglainternet.com

খাদ্য গ্রহণে কুসংস্কার থেকে অপুষ্টি

জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কুসংস্কার বলতে আমরা বুঝি এক ধরনের ভ্রান্ত ধারণা কিংবা দুষ্ট প্রথাকে। আবার যে বিশ্বাসের কোনও যুক্তি কিংবা ভিত্তি নেই একেও কুসংস্কার বলা হয়ে থাকে।

আমাদের দেশের অনেকেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পুষ্টিকর খাদ্য না খেয়ে অপুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে থাকে। ফলে অতি সহজেই অপুষ্টির শিকার হয়ে পড়ে। খাদ্য বিষয়ে আমরা সকলেই কিছু কিছু ভ্রান্ত ধারণাকে মেনে চলে থাকি। সুশিক্ষার অভাবেই আমরা এই ধরনের যুক্তিহীন কুসংস্কারকে মেনে চলি, শুধুমাত্র আমাদের দেশেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ ধরনের কুসংস্কার প্রচলিত আছে। যেমন– বর্মী মহিলারা শরীরে পানি আসার ভয়ে শাক সব্জি খায় না। মালদ্বীপের গর্ভবতী মহিলারা হাঁপানির ভয়ে মুরগীর মাংস খায় না। পাকিস্তানের গর্ভবতী মহিলারা পাকস্থলীতে ব্যথার ভয়ে আলু, ফুলকপি, শালগম ইত্যাদি খায় না। কামুকতা বৃদ্ধির ভয়ে সিরিয়ার শিশুদেরকে ডিম খেতে দেওয়া হয় না। আবার এশিয়ার কিছু কিছু দেশে বুকের দুধ বিষাক্ত হওয়ার ভয়ে মায়েদেরকে মাংস খেতে দেওয়া হয় না। এরকম বিভিন্ন কুসংস্কারের সাথে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছি। কুসংস্কার থেকে মুক্তি লাভের আশায় কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো ঃ

১। শৈশব কালে।
২। অসুস্থ হলে।
৩। গর্ভাবস্থায়।
৪। প্রসবের পরে।
৫। অন্যান্য অবস্থায়।

শৈশবকালে

আমাদের দেশের বেশির ভাগ শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। দারিদ্রতার চাইতেও এর একমাত্র কারণ হচ্ছে ভ্রান্ত ধারণা। শিশু জন্মের পর অধিকাংশ মা যে কাজটি করেন তা হচ্ছে শালদুধ (কলোস্ট্রাম) ফেলে দেন। তাদের ধারণা শালদুধ শিশুর হজম হবে না। কারণ এতে ভূত প্রেতের নজর লেগেছে। অথচ চিকিৎসকদের মতে শালদুধ শিশুর জন্য অত্যন্ত উপকারী। শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে থাকে। অনেকে আবার মনে করে থাকেন যে, জন্মের পর শিশুর মুখে মধু না দিলে শিশু মিষ্টভাষী হবে না। অথচ চিকিৎসকদের মতে শিশুর মুখে মধু

www.banglainternet.com

দিলে শিশুর পেট খারাপ হতে পারে। শিশুর খাদ্যে সবচাইতে বেশি প্রয়োজন শর্করা ও আমিষ জাতীয় খাদ্যের। অথচ অনেক মা-ই আছেন যারা মনে করে থাকেন ৭/৮ মাস বয়সে শিশুকে ভাত দিলে শিশুর পেট মোটা হবে। ডালে আমিষ থাকা সত্ত্বেও তারা মনে করেন ডাল খেলে শিশুর হজম হবে না এবং পেট মোটা হবে।

অথচ ৫/৬ মাস বয়স থেকে যদি শিশুকে সহায়ক খাবার না দেওয়া হয় তবে শিশুর বৃদ্ধি ব্যহত হবে। শিশুর জন্মের প্রথম দুই বছর শিশুর মস্তিষ্কের গঠন বৃদ্ধি পায়, তাই প্রথম দুই বছর শিশুকে ভাল করে খাওয়ালে মস্তিষ্কের গঠন উন্নত হয়। পরবর্তীতে শত খাওয়ালেও মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ঘটবে না– শুধু শারীরিক বৃদ্ধি ছাড়া। বাঙালী অনেক মা-ই আছেন যারা কৃমি বৃদ্ধি পাবার ভয়ে শিশুকে মাছ খাওয়ান না। তারা বলে থাকেন, মাছ খেলে নাকি পেট বড় হয়ে যায়। এছাড়া শিশুকে কৃমির ভয়ে কলা, গুড় চিনি ইত্যাদি শর্করা জাতীয় খাবার থেকে বঞ্চিত করা হয়। অথচ এগুলোর কোনওটাই কৃমির জন্য দায়ী নয়।

অসুস্থ হলে

অসুস্থ হলেও আমরা বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার মেনে চলি যা আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। একজন সুস্থ ব্যক্তির তুলনায় একজন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বেশি খাদ্যের প্রয়োজন হয়। অনেক মা আছেন যারা শিশুর ডায়রিয়া হলে শিশুকে পাতলা করে তৈরি বার্লি ছাড়া কিছুই খেতে দেন না। কিন্তু ডায়রিয়া হলে শরীর থেকে পুষ্টিকর উপাদানগুলো বের হয়ে যায়। ফলে শিশুর পুষ্টিকর খাদ্যের চাহিদা আরও বেড়ে যায়। কেউ কেউ আবার শিশুর ডায়রিয়া হলে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দেন। শক্ত কিংবা আধা শক্ত খাবার দিতে চান না। আবার এমনও দেখা যায় শিশুর হাম বা জ্বর হলে আমিষ জাতীয় খাদ্য খেতে দেন না। এসব ভ্রান্ত ধারণা শিশুর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং এতে করে শিশুরা মারাত্মক অপুষ্টির শিকার হয়। অনেকে মনে করেন শরীরে কোনও ক্ষত থাকলে টক জাতীয় ফল খেতে দেওয়া উচিত নয়। অথচ টক জাতীয় ফলে ভিটামিন 'সি' অধিক পরিমাণে থাকে এবং ক্ষত শুকোতে সহায়তা করে থাকে।

গর্ভাবস্থায়

আমাদের দেশে একান্নবর্তী পরিবারের মেয়েরা পুরুষের পরে অথবা সবার শেষে খাবার খেয়ে থাকেন। পারিবারিক বন্টনের এ অসম নীতির ফলে মাছ, মাংস,

www.banglainternet.com

দুধ, ডিম ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্যের অংশ থেকে মেয়েরা বঞ্চিত হয়। ফলে যদিও গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টিকর খাদ্য অধিক খাওয়া উচিত তারপরেও মায়েরা এসব খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

গর্ভবতী মায়েদের বাচ্চা বেশি বড় হলে প্রসবের সময় অসুবিধা হবে বিধায় তাকে কম খেতে দেওয়া হয়। এছাড়া আরও কিছু ভ্রান্ত ধারণা যেমন জোড়া কলা খেলে যমজ সন্তান হবে, খিরাই খেলে বাচ্চার শরীর ফাটা ফাটা হবে, হাঁসের ডিম খেলে গলার স্বর হাঁসের মতো ফ্যাসফ্যাসে হবে, এসব কারণে এগুলো গর্ভিণীকে খেতে দেওয়া হয় না। বাংলাদেশের দুটি উপজেলায় গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে যে, ৬ঃ৩% মা মৃগেল মাছ খান না সন্তানের খিঁচুনি হবার ভয়ে। পেটের অসুখের ভয়ে ১৪ঃ১% মায়েরা পুঁটি মাছ খান না এবং ১২ঃ৫% মায়েরা বোয়াল মাছ খান না। ৯ঃ৪% মায়েরা গর্ভপাতের ভয়ে আনারস খান না। ভূতে ধরার ভয়ে ১০ঃ৯% মা ডাল খান না। এসব কুসংস্কারের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ায় মায়েরা স্বাস্থ্যবান শিশু জন্ম দিতে পারেন না।

প্রসবের পরে

গর্ভাবস্থায় মায়েরা যেমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে কিছু খাদ্য খান না, তেমনি প্রসূতি অবস্থাতেও তারা কিছু খাদ্য বর্জন করে থাকেন। আমাদের দেশে প্রসবের পর অনেক মাকে সূতিকা রোগে আক্রান্ত হবার ভয়ে ইলিশ মাছ, গরুর মাংস, পুঁটি মাছ ইত্যাদি খেতে দেওয়া হয় না। এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে প্রসূতিকে শুধু মাত্র মরিচ ভর্তা দিয়ে ভাত দেওয়া হয় ঘা শুকোনোর জন্য। আবার দুধের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য কালোজিরার ভর্তা দেওয়া হয়। আবার নবজাতকের 'হাম' বা 'মাসী পিসী' হবার ভয়ে আমিষ জাতীয় খাদ্য দেওয়া হয় না। অনেক অঞ্চলে দেখা যায় প্রসবের পর দুই সপ্তাহ পর্যন্ত প্রসূতিকে কাঁচা কলার ভর্তা এবং পুরনো চালের জাউ ছাড়া কিছুই খেতে দেওয়া হয় না। ফলে মা পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত হয় সেই সাথে শিশুও বঞ্চিত হয়। কারণ শিশুরা মায়ের দুধ থেকেই পুষ্টিকর উপাদান পেয়ে থাকে। এসব কারণে প্রসূতিও দুর্বল হয়ে পড়েন এবং রক্তাল্পতায় ভুগে থাকেন। এমনকি প্রসবোত্তর রক্তস্রাব প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়ে প্রসূতির মৃত্যুও হতে পারে।

অন্যান্য অবস্থায়

এছাড়াও আমরা আরও বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার মেনে চলি। যেমন– অনেকে হজম হবে না এ ভয়ে বয়স্কদের দুধ খেতে দেয় না। কিন্তু দুধ বয়স্ক ও শিশু

www.banglainternet.com

Goto List >

সবার জন্যই আদর্শ খাদ্য। আবার অনেক সময় পুরুষ মানুষের কলিজা ছোট হয়ে যাবার ভয়ে ছেলেদেরকে মুরগীর কলিজা খেতে দেওয়া হয় না। অথচ কলিজায় প্রচুর ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে। আবার লিভারের ও মূত্রাশয়ের ক্ষতির সম্ভাবনায় বয়স্করা মাংস খান না। সুস্বাদু পনির একটি আমিষ, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার। অথচ অনেকেই কোষ্টকাঠিন্য ও হজমের ব্যাঘাতের জন্য পনির খান না। কিন্তু পনির খেলে হজমে ব্যাঘাত ঘটে না। আমাদের দেশের জনগণ আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে এমনিতেও মাছ, মাংস ও ডিম খেতে পারেন না। তার ওপর যদি ভ্রান্ত ধারণা থাকে তবে পুষ্টিকর উপাদান থেকেই তারা বঞ্চিত হবেন।

প্রতিকার

একটি দেশের অপুষ্টির জন্য যে কারণগুলো দায়ী তারমধ্যে একটি প্রধান কারণ হলো কুসংস্কার। এই কুসংস্কারগুলো মেনে চলার পেছনে কাজ করে অজ্ঞতা। সুতরাং এর প্রতিকারের জন্য অজ্ঞতা দূর করতে হবে।

শিশুদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন

১। ছেলেমেয়েদের সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর হাত মুখ ধোয়া, মলত্যাগের পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, খাওয়ার পূর্বে হাত ধোয়া, এবং খাবার নাড়াচাড়া করার পূর্বে হাত ধোয়া ইত্যাদি শেখাতে হবে।

২। ছেলেমেয়েদেরকে নিয়মিতভাবে গোসল করাবেন এবং প্রয়োজনে জামাকাপড় পাল্টে দেবেন।

৩। ছেলেমেয়েদেরকে নিয়মিত দাঁত মাজতে শেখাবেন। মিমি, চকলেট, মিষ্টি এগুলো বেশি খেতে দেবেন না।

৪। শিশুদের নখ ছোট করে কেটে দিন। খালি পায়ে শিশুদের হাঁটতে দেবেন না।

৫। ফুটিয়ে পানি পান করুন এবং পরিষ্কার পানি ব্যবহার করুন।

৬। যাদের ছোঁয়াচে রোগ আছে তাদের অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখুন।

৭। খোস, পাঁচড়া, দাদ, উকুন, ক্রিমি থাকলে এদের অতি সত্বর চিকিৎসা করাবেন।

৮। শিশুরা যাতে নোংরা জিনিস মুখে না দেয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

www.banglainternet.com

জন্মগত ত্রুটি রোধ করুন এবং সুস্থ শিশুর জন্ম দিন

আপনি যদি একটি সুস্থ ও সুন্দর শিশু চান তবে কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলুন। আশা করি নিরাশ হবেন না।

১। গর্ভাবস্থায় যতটা সম্ভব ভাল খাবেন। যেমন– মাছ, ডিম, ফল, শাক সব্জি ইত্যাদি।

২। সাধারণ লবণের পরিবর্তে আয়োডিন যুক্ত লবণ খাবেন।

৩। গর্ভাবস্থায় কোনও রকম ধূমপান বা মদ্যপান করা যাবে না।

৪। যতটা সম্ভব ওষুধ বাদ দিয়ে চলবেন। যে ওষুধগুলো গর্ভবতীর জন্য নিরাপদ সেগুলো ব্যবহার করবেন।

৫। একটির বেশি সন্তানের জন্মের সময় খুঁত থাকলে আর ছেলেমেয়ে জন্ম দেবেন না।

৬। ৩৫ বছর বয়সের পর আর সন্তান জন্ম দেবেন না।

www.banglainternet.com

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

রোগ এড়ানো এবং রোগ সারানোতে পানির উপযুক্ত ব্যবহার

পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া কোনও মানুষই বাঁচতে পারে না। আমাদের শরীরের ৫৭ ভাগই পানি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পানির ব্যবহার অপরিহার্য। পানির উপযুক্ত ব্যবহার করলে অর্ধেক রোগ আর মৃত্যু কমে যাবে। এজন্য কিছু রোগে পানির উপযুক্ত ব্যবহার কিভাবে করবেন তা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

১। পাতলা পায়খানা বা শরীরে পানির অভাব হলে প্রচুর তরল জিনিস খাবেন।

২। পাতলা পায়খানা, কৃমি বা যে কোনও পেটের পীড়া এড়াতে পানি ফুটিয়ে পান করুন। খাওয়ার পূর্বে ভালভাবে হাত ধুয়ে নিন।

৩। কোষ্ঠকাঠিন্য হলে প্রচুর পানি পান করুন।

৪। শরীরের কোথাও যদি অল্প স্বল্প পুড়ে যায় তবে প্রচুর ঠাণ্ডা পানি ঢালুন।

৫। সর্দি, কাশি, হাঁপানি নিমোনিয়া এবং ব্রঙ্কাইটিস হলে শ্লেষ্মা তরল করার জন্য প্রচুর পানি পান করুন এবং গরম পানির ভাপ নিন।

৬। চামড়ায় যদি কোনও সংক্রমণ ঘটে থাকে তবে নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে গোসল করুন।

৭। খুব বেশি জ্বর হলে এবং তাপদাহ হলে সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন।

৮। শরীরে ক্ষত হলে ক্ষতের সংক্রমণ এড়ানোর জন্য সাবান পানি দিয়ে ক্ষত ধুয়ে ফেলুন।

৯। মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ ঘটলে প্রচুর পানি পান করুন।

১০। মলদ্বারে যদি ঘা হয়ে থাকে, তবে এক গামলা কুসুম গরম পানিতে এক চিমটি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে ঐ পানির মধ্যে কিছু সময় বসে থাকুন।

www.banglainternet.com

Goto List >

১১। যদি খোস, পাঁচড়া, খুসকি, ব্রণ, দাদ ইত্যাদি হয়ে থাকে তবে সব সময় সাবান পানি দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে রাখবেন।

১২। চামড়ায় যদি খুব বেশি চুলকানি হয়, জ্বালা করে কিংবা চুলকানি থেকে রস গড়িয়ে পড়ে তবে ঠাণ্ডা পানির সেঁক দিন।

১৩। গলা ব্যথা কিংবা টনসিলে সংক্রমণ ঘটলে গরম পানির মধ্যে লবণ দিয়ে কুলকুচি করুন।

১৪। শরীরের কোনও ঘা বা ফোড়ার মধ্যে সংক্রমণ হলে গরম পানি দিয়ে সেঁক দিন।

১৫। চোখে ধুলো, বালি কিংবা এসিড ক্ষার ইত্যাদি পড়লে প্রচুর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

১৬। সর্দিতে নাক বন্ধ হয়ে গেলে লবণ-পানি নাক দিয়ে টানুন।

১৭। গরমের দিনে যখন অতিরিক্ত গরম পড়বে তখন কয়েকবার করে গোসল করবেন এবং সারাদিন প্রচুর লবণ-পানি খাবেন।

১৮। যে সব রোগের সঙ্গে জ্বর থাকবে সেসব রোগে প্রচুর তরল জিনিস খাবেন।

www.banglainternet.com

ষড়বিংশ অধ্যায়

ভ্রমণে শারীরিক বিড়ম্বনা এড়ানোর উপায়

কোথাও বেড়াতে গেলে কিংবা ভ্রমণে গেলে অনেকেই আছেন যারা অসুস্থতা বোধ করে থাকেন। এদের জন্য অন্য আরও যারা ভ্রমণে আসনে কিংবা সহযাত্রীরা বিরক্তি বোধ করে থাকেন। বেড়াতে গেলে সব সময় ডাক্তার পাওয়া যায় না। এজন্য বেড়াতে যাবার সময় কিছু কিছু ওষুধ পত্র সঙ্গে নেওয়া ভাল।

বেড়াতে গেলে কি কি সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন

হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যাওয়া

কোথাও বেড়াতে গেলে আবহাওয়ার পরিবর্তন, নতুন পরিবেশ এবং তাপমাত্রার হেরফেরের জন্য যে কোনও মানুষই হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।

শরীরের কোনও অংশ হঠাৎ কেটে বা ছিঁড়ে যাওয়া

শিশুরা বেড়াতে গেলে এক স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করে। নগর জীবনের বন্দী দশা থেকে মুক্তি পেয়ে তারা যেন এক অফুরন্ত আনন্দে মেতে ওঠে। লাফালাফি ছোটাছুটি করে থাকে যখন তখন যে কোনও মুহূর্তে পড়ে গিয়ে হাত পা ছিঁড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এজন্য সাথে একটি ফার্স্ট-এড বক্স থাকলে ভাল হয়। বাসে বা ট্রেনে যখন ভ্রমণ করবেন তখন শিশুদেরকে জানালা দিয়ে সামনের দিকে তাকাতে দেবেন না এবং নিজেরাও তাকাবেন না।

পেটের বিভিন্ন সমস্যা

ডায়রিয়া

বাইরের খাবার স্বাস্থ্যসম্মত হয় না, তাই বাইরের খোলা খাবার খেয়ে অধিকাংশ লোকের ডায়রিয়া বা ফুড পয়জনিং হয়ে থাকে।

www.banglainternet.com

বদহজম

কোথাও ভ্রমণে গেলে কিংবা ছুটি ছাটার সময় অধিকাংশ লোক বেশি খাবার খেয়ে থাকেন। আর যদি সে খাবার ভাজাভুজি এবং অতিরিক্ত মশলাযুক্ত হয় তবেই বদহজমের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ফুড এলার্জি কিংবা স্কিন এলার্জি

বিশেষ কিছু খাবারের প্রতি কারও কারও এলার্জি থাকে। আবার খুব বেশি রোদের জন্যও এলার্জি হয়ে থাকে।

কোষ্ঠকাঠিন্য

বেড়াতে গেলে খাওয়ার সময়ের পরিবর্তন হয়ে যায়, খাবারের পরিবর্তন হয় এবং টয়লেটে যাওয়ার অভ্যাসের পরিবর্তন হয়। যার জন্য অনেকের ক্ষেত্রে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়ে থাকে।

কারও যদি নির্দিষ্ট রোগ থেকে থাকে তা বেড়ে যাওয়া

যাদের কিছু নির্দিষ্ট রোগ আছে যেমন– ডায়াবেটিস, ব্লাডপ্রেসার, অ্যাজমা, মাথাব্যথা, আরথারাইটিস ইত্যাদি। এরা যদি বেড়াতে যাওয়ার সময় ওষুধগুলো সঙ্গে না নেন কিংবা খাওয়ার অনিয়ম করেন, তবে তাদের রোগ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

অনিদ্রা

নিজের বিছানা ছাড়া অনেকেই ঘুমোতে পারেন না। আর ঘুম পুরোপুরি না হলে শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। আবার ভ্রমণের সময় যদি রাস্তাঘাট ভাল না থাকে কিংবা অনেক দূরের ভ্রমণ হয় তাহলেও শারীরিক সমস্যা হতে পারে।

রোদে পোড়া

সাধারণত যাদের রঙ ফর্সা এরা রোদে বেশি ঘোরাঘুরি করলে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মিতে ত্বক পুড়ে যেতে পারে, সাধারণত বেলা ১১ থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং এ সময় টেকো টুপি কিংবা ছাতা ব্যবহার করা ভাল।

www.banglainternet.com

ফাংগাস ইনফেকশন

গরমের দিনে বেড়াতে বেরোলে খুব বেশি ঘাম হয়। যার ফলে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় যেমন– কুঁচকি, নিতম্ব ইত্যাদি স্থানে ফুসকুড়ি ও চুলকানি হতে পারে।

বমি হওয়া

বেড়াতে গেলে অনেকেরই বমির ভাব কিংবা বমিও হয়। একে মোশন সিকনেস বলা হয়।

শিশুদের সঙ্গে নিয়ে যখন বেড়াতে যাবেন

শিশুদের নিয়ে বেড়াতে বের হলে নানারকম অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কারণ শিশুরা সহজে পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে পারে না। শিশুদের যদি খাওয়া এবং ঘুমের সমস্যা হয় তবে শিশুরা খুবই কান্নাকাটি করে থাকে। এজন্য বেড়াতে বের হলে শিশুদেরই বেশি সমস্যা হয়। কিছু কিছু শিশু আছে যারা বেড়াতে গেলে বমি করে কিংবা জ্বর হয়। তাই বেড়াতে গেলে শিশুদের খাবার এবং বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

যদি খুব বেশি মশা থাকে কিংবা ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত এলাকা হয়ে থাকে

আপনি যে জায়গায় বেড়াতে যাবেন সে জায়গায় যদি মশা বেশি থেকে থাকে তবে সাথে করে মশারী এবং মশার ওষুধ নিয়ে যাবেন। যদি ম্যালেরিয়া অধ্যুসিত এলাকা হয় তবে সপ্তাহে দুটো ক্লোরোকুইন খেয়ে নেবেন (চিকিৎসকের পরামর্শ মতো)।

যদি কোনও রকম পোকামাকড় কামড়ায়

ছুটি ছাটায় কোথাও বেড়াতে গেলে পোকামাকড় কামড়াতে পারে। যদি পোকামাকড় কামড় দেয় তবে তৎক্ষণাৎ ক্ষত স্থানটি কলের নিচে ধরবেন। পরিষ্কার করে যখন ধোয়া হয়ে যাবে অর্থাৎ ক্ষতস্থান থেকে যখন পোকার বিষ ধুয়ে যাবে তখন ঐ ক্ষতস্থানে স্পিরিট জাতীয় কোনও লোশন লাগিয়ে দেবেন। যেমন– আফটার শেভ লোশন। এতে করে শিশুর বিষক্রিয়া হবে না। ভিনিগারও ঐ ক্ষতস্থানে লাগাতে পারেন। ক্ষতস্থান যদি ফুলে গিয়ে লাল হয়ে যায় তবে এন্টিহিস্টামিন খাইয়ে দেবেন। আর যদি ব্যথা থাকে তবে প্যারাসিটামল দিতে পারেন। এজন্য বেড়াতে গেলে শিশুদের সাবধানে রাখতে হবে।

www.banglainternet.com

ঘামাচি হলে কি করবেন

যদি গরমের দিনে কোথাও বেড়াতে যান তবে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত বের না হওয়াই ভাল। গরম আবহাওয়ায় বের হলে হাতে, মুখে, বুকে, পিঠে, লাল লাল দানার মতো ঘামাচি বের হতে পারে। অতিরিক্ত ঘেমে যাওয়ার ফলে ঘর্মগ্রন্থি বন্ধ হয়ে যায় এবং ঘামাচি নামক র‍্যাশ শরীরে বের হয়। তাই যদি রোদে বের হতেই হয় তখন ঐ ধরনের পোষাক পরে সঙ্গে ছাতা কিংবা সানগ্লাস নিলে ভাল হয়। শরীরে ঘামাচি হলে বার বার ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করুন সম্ভব হলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে থাকতে চেষ্টা করুন।

বেড়াতে যাবার পূর্বে আপনার যা করা উচিত

আপনার বেড়ানোর প্রোগ্রাম যদি কিছুদিনের জন্য হয় তবে আপনাকে সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও ওষুধ সঙ্গে নিতে হবে। প্রতিটি ব্যক্তিরই নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া ভাল, কারণ যার যে রোগ রয়েছে যেমন– আলসার, হাঁপানী ইত্যাদি রোগ থাকলে তার সেই অনুযায়ী ওষুধ পত্র সঙ্গে নিয়ে নেওয়া উচিত। আর এজন্য পারিবারিক চিকিৎসকের সাথে আলাপ করে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী ওষুধ নেবেন। সেই সাথে নিম্নবর্ণিত ওষুধগুলো নিতে ভুলবেন না–

১। মাথা ধরা, মাথা ব্যথা কিংবা অল্প জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় টেবলেট সঙ্গে নিন।

২। কেটে বা ছিঁড়ে গেলে তার জন্য একটি বক্সে ব্যান্ডেজ, কাঁচি, ফরসেপ, লিউকোপ্লাস্টার, এন্টিসেপটিক লোশন অথবা ক্রীম সঙ্গে নেবেন।

৩। পোকা মাকড়ের কামড় এবং র‍্যাশ যদি বেরোয় তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এন্টিহিসটামিন অথবা এন্টিএলার্জির টেবলেট সঙ্গে নেবেন। এসব ওষুধ ঠাণ্ডা কিংবা ফ্লুতেও কাজে লাগবে।

৪। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পেটে ব্যথার ওষুধ সঙ্গে নেবেন।

৫। আমাশয়ের জন্য কিছু ওষুধ সঙ্গে নেবেন, যা আপনার পেটে সহ্য হবে।

৬। দূরে কোথাও যদি ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকে, তবে সঙ্গে পাউডার নিয়ে নেবেন।

৭। রোদের হাত থেকে আপনার চোখ ও চোখের চারপাশ রক্ষার জন্য সান গ্লাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এগুলো ছাড়াও আপনার যদি বিশেষ কোনও রোগ থেকে থাকে, তবে সে রোগের ওষুধগুলো মনে করে সঙ্গে নেবেন। বেড়াতে গেলে দেখা যায় ৭৫ ভাগ

www.banglainternet.com

রোগই হয় খাবার কিংবা পানি থেকে। ডায়রিয়া এবং বিভিন্ন প্রকার পেটের অসুখে পানিই একমাত্র দায়ী। তাই যথাসম্ভব বাড়ি থেকে পানি নিয়ে যাবেন এবং প্রয়োজনে 'মিনারেল ওয়াটার' কিনে খাবেন।

ভ্রমণের জন্য কিছু টুকিটাকি উপদেশ

১। কখনও রাস্তার খোলা খাবার খাবেন না। খোসা ছাড়ানো কিংবা কাটা ফল কিনবেন না।

২। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কোনও জিনিস খাবেন না। অতিরিক্ত মশলাযুক্ত কোনও খাবার কিংবা ভাজাভুজি খাবেন না।

৩। শিশুদের জন্য কখনও খোলা দুধ কিনবেন না। কোথাও বেড়াতে গেলে সঙ্গে করে কৌটোর দুধ, কনডেনস্ মিল্ক এবং ফ্লাস্কে করে গরম পানি নিয়ে যাবেন।

৪। শিশুদের জন্য বিস্কুটের প্যাকেট, বাদাম, আস্ত বা গোটা ফল কিনবেন।

৫। জায়গা ও খাবারের পরিবর্তন ঘটলে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। এজন্য প্রচুর পানি পান করুন এবং বেশি বেশি ফল খান।

৬। রান্না করা খাবার অনেকক্ষণ রেখে খেলে খাবারে ছত্রাক জন্মাতে পারে। এজন্য খাবার সময় পুনরায় গরম করে খেতে হবে।

৭। ভ্রমণে বের হলে যতটা সম্ভব রোদ এড়িয়ে চলুন। রোদ যাতে করে না লাগে সে ব্যবস্থা করবেন। এবং বার বার অল্প লবণ, চিনি ও লেবুর সরবত খাবেন।

৮। ভ্রমণে বের হলে অনেকের কেটে ছিঁড়ে গিয়ে থাকে। যদি বেশি রকম কেটে যায় তবে ডাক্তার দেখিয়ে টিটেনাসের ব্যবস্থা করবেন।

৯। অনেকে ভ্রমণে গেলে ঘুম আসতে চায় না। ঘুম না এলে ঘুমের ওষুধ না খেয়ে কোনও বই বা ম্যাগাজিন পড়তে থাকুন। দেখবেন, একসময় এমনিতেই ঘুম এসে যাবে।

১০। যাদের খুব বেশি ঘাম হয় তারা খাবারের সাথে লবণ খাবেন প্রয়োজনে ওরাল স্যালাইন খেতে পারেন।

www.banglainternet.com

সপ্তবিংশ অধ্যায়

মেয়েদের কয়েকটি মানসিক সমস্যা ও তার চিকিৎসা

আমাদের দেশের মেয়েদের অর্থনৈতিক অধিকার না থাকায় মেয়েরা সমাজে সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত। সামাজিক বাধা-নিষেধের শিকার প্রধানতঃ তারাই। আর সম্ভবত এসব কারণেই মহিলারাই বেশি মানসিক সংঘাতে ভুগে থাকেন। মহিলাদের কিছু মানসিক সমস্যা, ঋতু সমাপ্তি, সন্তান প্রসব ও ঋতুস্রাবের সাথে জড়িত এ ধরনের কিছু সমস্যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

মহিলাদের গর্ভকালীন মানসিক সমস্যা

গর্ভাবস্থায় অনেক মহিলার মধ্যে বিষাদ দেখা যায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণেই এ ধরনের বিষাদ সৃষ্টি হয়ে থাকে। গর্ভাবস্থা মহিলাদের দুশ্চিন্তার একটি প্রধান কারণ। কিন্তু গর্ভাবস্থায় মানসিক রোগ খুব কম ঘটে থাকে। গর্ভাবস্থার শেষ তিন মাসে মেজাজের খিটখিটে ভাব পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ হচ্ছে অধিকাংশ মহিলাই ভেবে থাকেন পরিবারে কোনও রকম অর্থনৈতিক চাপ বাড়বে কি-না, বাচ্চা কোনও রকম খুঁত নিয়ে জন্মাবে কি-না এবং সংসারের বাড়তি দায়িত্ব তিনি পালন করতে পারবেন কি-না ইত্যাদি।

চিকিৎসা

গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন জনে বিভিন্ন রকম কথা বলে থাকেন। এভাবে অনেকের কাছ থেকে পাওয়া ভুল তথ্য ও ভুল ধারণা রোগিনীকে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ করে তোলে। এ ব্যাপারে পরিবারের অন্যান্যদের সাথে খোলাখুলি আলোচনা করা ভাল। স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করা এ সময় বেশি প্রয়োজন। সবার সহযোগিতা ও সমঝোতা রোগিনীকে বিশেষ সাহায্য করবে।

মাসিক-পূর্ব মানসিক সমস্যা

মাসিকের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব থেকেই রোগিনীর মধ্যে দৈহিক, মানসিক এবং আচরণগত পরিবর্তন দেখা দেয়। ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গেলে এ ধরনের সমস্যা আর থাকে না।

www.banglainternet.com

কি কি লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়

এ সময় প্রায় সবাই ব্যথা বোধ করে থাকে। এছাড়াও মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। আবার অনেকের মধ্যে দুশ্চিন্তা, বিষাদ গ্রস্থতা, অস্থিরতা ইত্যাদি দেখা যায়। মাথা ধরা, বুক ধড়ফড় করা ও নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি প্রায় সবার মধ্যেই দেখা যায়। এ ছাড়া বমি ভাব, মাথা ঘোরা ইত্যাদিও ঘটে থাকে। এমন অনেকে আছেন যারা অতিরিক্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণাবোধ, যৌনবোধের আধিক্য, নিদ্রাধিক্য ইত্যাদি বোধ করে থাকেন।

অনেকের স্তনের স্ফীতি ও ব্যথা, তলপেট ভারী বোধ হয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, শতকরা ৮০ জন মহিলাই মাসিক পূর্ব অস্থিরতা বোধ করে থাকেন। কারণ নির্ণয়ের জন্য অনেকে বলে থাকেন ইস্ট্রোজেন হরমোনের আধিক্য এবং প্রজেসট্রোজেনের স্বল্পতা এর জন্য দায়ী। অনেকে মনে করেন জৈবিক কারণে এ রকম হয়ে থাকে। তারা মানসিক ও সামাজিক সমস্যাকে এজন্য দায়ী করে থাকেন।

চিকিৎসা

রোগিনীর মনে যদি কোনও নৈরাশ্য জন্মে থাকে, তবে তা দূর করে আত্মবিশ্বাস জন্মাতে হবে। এর জন্য স্বামীর সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রয়োজন। দৈনন্দিন জীবনে কোনও সমস্যা থাকলে সেগুলো দূর করার জন্য রোগিনীর সাথে খোলামেলা ভাবে আলোচনা করতে হবে। যারা একটু বেশি পরিমাণে অসুবিধা বোধ করেন তারা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বিষাদ দূরীকরণ ওষুধ কিংবা ঘুমের ওষুধ ব্যবহার করতে পারেন।

প্রসবের পরবর্তী মানসিক সমস্যা

সন্তান প্রসবের পর কিছু কিছু মহিলার মানসিক সমস্যা দেখা যায়। তবে এদের সংখ্যা কম। যারা পূর্ব থেকেই হর্ষবিষাদোন্মতায় ভুগে থাকেন এদের ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটে থাকে। শতকরা ৫ ভাগ মহিলার এ ধরনের সমস্যা হয়। সাধারণত প্রথম প্রসবের পরই এ রকম হয়ে থাকে।

এ রোগের লক্ষণ সমূহ

রোগ শুরু হবার প্রথমে চেতনার আচ্ছন্নতা থাকে। এরপর ধীরে ধীরে চঞ্চলতা, উত্তেজনা, নিদ্রাহীনতা, খিটখিটে মেজাজ ইত্যাদি দেখা দেয়। সন্তান প্রসবের প্রথম দুইদিন কোনও উপসর্গ থাকে না। আস্তে আস্তে বিশেষ একটি রোগ নির্দিষ্ট রূপ নেয়।

www.banglainternet.com

চিকিৎসা

এ ধরনের মানসিক সমস্যায় অন্য সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। সংসারের দৈনন্দিন সমস্যা ও দুশ্চিন্তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। প্রসবোত্তর নারীকে মানসিক সমর্থন দান করতে হবে।

রজবন্ধ বা মেনোপজ জনিত মানসিক সমস্যা

মেনোপজের সময়টাতে শতকরা ৭৫ জন মহিলা কোনও না কোনও সমস্যায় ভুগে থাকেন। হরমোনের পরিবর্তনকে অনেকে বিষাদের কারণ বলে মনে করেন। বিভিন্ন কারণে বিষাদ ঘটে থাকে। যেমন– অনেক মহিলাই মনে করে থাকেন মাসিক বন্ধ হওয়া মানে যৌন জীবনের পরিসমাপ্তি কিংবা বার্ধ্যক্যের শুরু। এছাড়াও ঘরোয়া কিছু ব্যাপার যেমন– সন্তানরা তাদের সংসার শুরু করে এবং দূরে সরে যায়। অধিকাংশ মহিলা এ সময় রাতে উষ্ণ প্রবাহ বোধ করে থাকেন।

চিকিৎসা

ইস্ট্রোজেন হরমোন রাতে ঘেমে যাওয়া রোধ করে। কিন্তু মানসিক সমস্যার জন্য মনোবিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা প্রয়োজন।

গর্ভ নিরোধ বড়ি কিংবা বন্ধ্যাকরণ

গবেষণায় দেখা গেছে, গর্ভনিরোধ বড়ি সেবনে বিষাদোন্মত্ততা, যৌনতা হ্রাস, রক্তনালীতে অস্বাভাবিকতা এমন কি ক্যান্সারের কথাও অনেকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নিশ্চিত ভাবে এখনও কিছু জানা যায়নি।

গর্ভাবস্থার পরিসমাপ্তির সাথে মানসিক সমস্যা

রোগিনীর কিংবা তার গর্ভের সন্তানের যদি স্বাস্থ্যহীনতা কিংবা জীবন সংশয় দেখা দেয় তবে ডাক্তারের পরামর্শ মতো গর্ভাবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। এ অবস্থায় কখনও মানসিক সমস্যা দেখা দিতেও পারে, আবার নাও হতে পারে।

অস্ত্রপচার দ্বারা জরায়ুর অপসারণে মানসিক সমস্যা

পূর্বে জরায়ুর অপসারণকে মানসিক সমস্যার কারণ মনে করা হতো। বর্তমানে এ ধারণা সঠিক বলে বিবেচিত নয়।

www.banglainternet.com

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কয়েকটি নিরাপদ নীতি

১। নিজের ডাক্তারি নিজে করবেন না। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ গ্রহণ করুন।

২। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ওষুধের পূর্ণ মেয়াদী মাত্রা গ্রহণ করুন। শরীর কিছুটা সুস্থ বোধ করলেই ওষুধ বন্ধ করে দেবেন না।

৩। ওষুধের সময়কাল উত্তীর্ণ হয়ে গেলে সে ওষুধ গ্রহণ করবেন না।

৪। চিকিৎসক যদি কোনও ওষুধ দিনে তিনবার গ্রহণ করতে বলেন, তবে রুটিন মাফিক তা গ্রহণ করবেন। আপনি যদি পর পর দু'বার ওষুধ গ্রহণ করতে ভুলে গিয়ে থাকেন তবে তিনবারের ওষুধ একবারে গ্রহণ করবেন না।

৫। আপনি যদি ওষুধের কোনও রকম খারাপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে থাকেন, তবে অতি সত্বর চিকিৎসককে জানাবেন।

৬। ওষুধের যদি লেবেল না থাকে তবে ওষুধের পরিচয় নিশ্চিত না হয়ে ওষুধ গ্রহণ করবেন না।

৭। গর্ভবতী অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ গ্রহণ করুন।

৮। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ওষুধ সেবন করবেন না। স্বল্প মাত্রার ওষুধে যদি আপনার রোগ সেরে যায়, তবে ওষুধের মাত্রা বাড়াবেন না।

৯। যদি কোনও ওষুধের প্রতি আপনার অসহিষ্ণুতা থেকে থাকে তবে তা আপনার চিকিৎসককে জানান।

১০। আপাত দৃষ্টিতে ওষুধ নিরাপদ মনে হলেও শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সবশেষে আপনার জন্য ১০টি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

১। আপনার নিজের প্রতি খেয়াল রাখুন এবং নিজেকে ভাল রাখার চেষ্টা করুন। আপনি যদি শারীরিকভাবে সুস্থ থাকেন, সমাজের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারবেন।

www.banglainternet.com

২। আপনার উচিত এমন কোনও ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া যিনি আপনাকে উপযুক্ত চিকিৎসার নিশ্চয়তা দিতে পারবেন।

৩। আপনার শারীরিক অসুস্থতার জন্য ডাক্তার বিভিন্ন রকম পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য বলতে পারেন। আপনাকে তা ধৈর্য্য সহকারে গ্রহণ করতে হবে।

৪। আপনাকে এমন একজন ডাক্তারকে সনাক্ত করতে হবে যিনি আপনার শারীরিক অসুবিধাসমূহ মনযোগ দিয়ে শুনবেন। এবং উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৫। আপনার একজন মনের মতো বন্ধু থাকা উচিত। যার সঙ্গে আপনি মন খুলে বিভিন্ন রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারেন। তবে সবার আগে ডাক্তারের সাথে আলোচনা করবেন এরপর বন্ধুর সাথে।

৬। আপনি যদি স্বাস্থ্যবীমা করে থাকেন তবে নিয়মিত বীমার টাকা পরিশোধ করে যাবেন।

৭। আপনি যে ডাক্তার দেখাবেন, ডায়াগনোসিস করাবেন সে ব্যাপারগুলো এবং কাগজপত্র আপনার রেকর্ডে রাখবেন।

৮। ডায়াগনোসিস করার পর আপনার রোগ ধরা পড়লে ধৈর্য্য ধরে চিকিৎসা করবেন।

৯। আপনি যদি দীর্ঘদিন যাবৎ শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকেন, তবে উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থাকে মোটেও অবহেলা করবেন না।

১০। আপনি যে সব রোগে আক্রান্ত সে সব রোগ সম্বন্ধে তথ্য জানার জন্য লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশোনা করলে আপনি মানসিকভাবে স্বস্তি পেতে পারেন।

---

www.banglainternet.com